রোগশয্যার প্রলাপ

শ্রীরোগাতুর শর্ম্মা

ওরফে

বোমকেশ মুস্তফী-প্রণীত

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত

কলিকাতা

১৩৩০

কলিকাতা,

৭।১ নং জগন্নাথ স্থরের গলি,

দর্জ্জিপাড়া হইতে

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য এক টাকা মাত্র

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,

এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

সমর্পণ

পরম পূজনীয়,

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

শ্রীকরকমলেষু

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

ব্যোমকেশ দাদার শেষ-রচনা "রোগশয্যার প্রলাপ" আপনার অনুমতি না লইয়াই, আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আপনি গত কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার বড় সাধের ছোট ভাইগুলির,—তাঁহার প্রাণোপম প্রিয় সাহিত্য-পরিষদের ও সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পূর্ণ ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। আপনার অপূর্ব্ব চরিত্র-মাধুর্য্যে আজ সকলে মুগ্ধ।

ব্যোমকেশ দাদার কথায় আপনার কত আনন্দ, তাঁহার অসমাপ্ত ব্রত পূর্ণ করিতে আপনার কি উৎসাহ,—তাঁহার কৃত কার্য্য আপনার চক্ষে কি অপূর্ব্ব মহিমা-গৌরবে প্রতিভাত! তাই রোগশয্যায় শায়িত ব্যোমকেশ দাদার ক্ষীণ-লেখনী-প্রসূত এই রচনা আপনাকে সমর্পণ করিলাম। এ সমর্পণের অধিকার

আমার আছে কি না জানি না, কিন্তু ইহা স্থির জানি ও বিশ্বাস করি, ব্যোমকেশ দাদার পরলোকগত আত্মা আমার এ কার্য্য সানন্দে অনুমোদন করিবেন এবং পরিতৃপ্ত হইবেন। আশা করি, আপনার প্রাণপ্রিয় বন্ধু ও আত্মীয়ের এই দান সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত ও আমাকে ধন্য করিবেন। ইতি

প্রণত

নলিনী

সম্পাদকের নিবেদন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক, সাহিত্যগত-প্রাণ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের শেষ-রচনা "রোগশয্যার প্রলাপ" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। দুরারোগ্য ব্যাধি-প্রপীড়িত অবস্থায় শয্যাগত থাকার সময়ে তিনি এগুলি রচনা করেন। তাঁহার শীর্ণ হস্তের ক্ষীণ-লেখনী-প্রসূত এই রচনা, প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রিয় দেশবাসী সাদরে ও সানন্দে গ্রহণ করিবেন।

এই রচনাগুলি সুবিখ্যাত 'মানসী' পত্রিকায় ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ১৩২৩ সালের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বাহির হয়। সে-গুলি সে সময়ে সাধারণে আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং রোগ-কাতর মস্তিষ্কের ভিতর হইতে কি অপূর্ব্ব সাহিত্য-রসের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা পরলোকগত আচার্য্য ব্যোমকেশ-প্রিয় রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা-পাঠে জানিতে পারি—"ব্যোমকেশ সাহিত্য-রসে রসজ্ঞ ছিলেন। নিজে রস অনুভব করিতেন—সরস রচনা দ্বারা অন্যকে সে রসের আস্বাদন দিতে পারিতেন। এমন কি, 'রোগাতুর শর্ম্মার' প্রলাপ-বাক্যেও সেই রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।" ব্যোমকেশ-ভক্ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহ ও আগ্রহে সেগুলি সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালার পাঠক-সমাজকে উপহার দিলাম।

সাধ ছিল, তাঁহার এই গ্রন্থ-সম্পাদন-ব্যপদেশে, তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিব। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-

সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনের গুরুভার মস্তকে লইয়া সে সাধ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। যদি কখনও এ গ্রন্থের দ্বিতীয়-সংস্করণ হয়, তবে সে সময়ে এ সাধ মিটাইবার চেষ্টা করিব।

উপস্থিত তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া, আমার এ সংক্ষিপ্ত নিবেদনের উপসংহার করিব। বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা-সাহিত্য ও বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবীর সেবার জন্য একমাত্র ব্যোমকেশ মুস্তফীই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

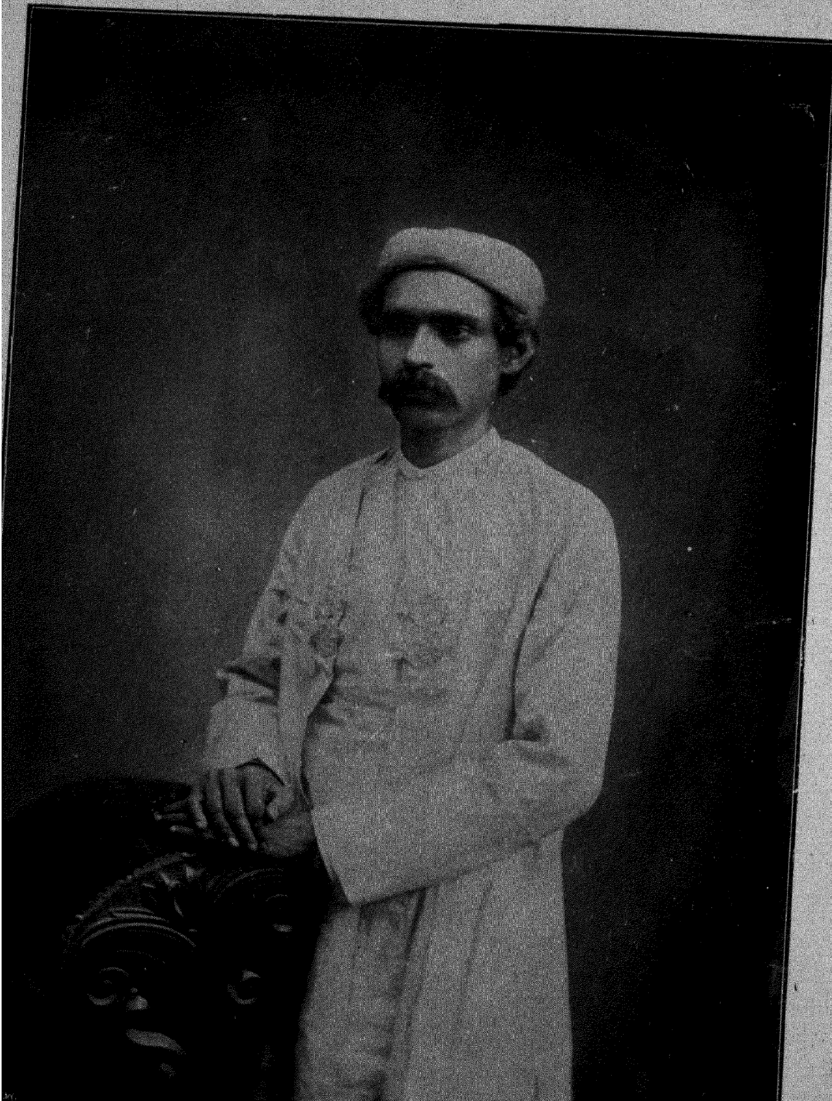
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উন্নতি, পুষ্টি ও প্রসারের জন্য একমাত্র ব্যোমকেশই শরীর, মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। দিন-রাত্রি, শয়নে-জাগরণে, আহারে-বিহারে, ভ্রমণে-উপবেশনে পরিষৎ ও সম্মিলনের কথাই তাঁহার ধ্যান ও জ্ঞান ছিল।

ধূপ যেমন দগ্ধ হইয়া আপনার সুগন্ধ-বিস্তারে অপর সকলের চিত্তকে মোহিত করে, ব্যোমকেশও তেমনি সাহিত্য-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, সাহিত্যের সেবায় ও কল্যাণ-কামনায় নিজের শরীরের শেষ-রক্ত-বিন্দুটি পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এ দানের ঋণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন বা বাঙ্গালার সাহিত্যিক-সমাজ কোন দিন পরিশোধ করিতে পারিবে না। ইতি—

দশহরা
৮ই আষাঢ়, ১৩৩০
কলিকাতা

বিনীত
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

রোগশয্যার প্রলাপ—



৺ব্যোমকেশ মুস্তফী

রোগশয্যার প্রলাপ

১

ছয় মাস রোগশয্যায় পড়িয়া আছি। রোগ বেশী কিছু নয়,—একটু জীর্ণ-জ্বর, একটু কাশি,—জ্বরের আগম-নিগম—আমি রোগী—আমি জানিতে পারি না,—জ্বরের আগম-লক্ষণ—শীত, গাত্রভঙ্গ, গাত্রবেদনা, মাথার যন্ত্রণা, তৃষ্ণা, গা-জ্বালা, ঘর্ম্ম, অবসাদ,—তাও কিছু দেখি না। আজ ছয় মাস এইভাবে জ্বরের সঙ্গে একাত্মভাবে ঘরকন্না করিতেছি, অথচ তিনি কখন্ আসেন, কখন্ যান, তা জানিতে পারি না,—গুলিটুলি কখনও খাই নাই, তবু এত বড় একটা জ্বরাসুর গৃহে যাতায়াত করে, তার মাথাই দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই—কেবল হিক্‌সের থার্ম্মোমিটার আর নাড়ীজ্ঞানী কাকা মহাশয়ের আঙ্গুলগুলি। একজন বলেন,—"এই ৯৯° জ্বর," "এই ১০০° জ্বর"; অন্যেরা বলেন,—"হুঁ জ্বরের বেগ হইয়াছে, এখন জ্বর নাই, কিন্তু বেগ আছে; জড়তা আছে," ইত্যাদি। আমি এবং আমার চিকিৎসকেরা মাথা পাতিয়া স্বীকার করি,—'তথাস্তু'।

আমি একটু খুসী আছি;—দেখিতেছি, ডাক্তার কবিরাজেরা প্রত্যহ আসিতেছেন—কণ্ঠায়, হৃদয়ে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে টোকা মারিতেছেন, কণ্ঠশ্বাসের

রিহার্স্যাল্ দেওয়া হইতেছে, দুই হাতে দুই দিকে চাপ দিতেছেন, কেহ বা একেবারে বর্ণপরিচয় হইতে সুরু করিয়া এ, বি, সি, ডি, বলাইতেছেন, কেহ বা 'নাইন্টি-নাইন' বলাইয়া, আমি যে এবার নিরানব্বইয়ের ধাক্কায় পড়িয়াছি, তাহা উপলব্ধি করাইতেছেন; ভগবানের কল কারখানা—বুকের কোথায় কি বিগড়াইয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিয়া পেটের মধ্যে যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রাধার, মলস্থলী টিপিয়া, সে ডিপার্ট্মেণ্টে কোথাও কিছু বিগড়াইল কি না, তাহা ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন; ফলে কিন্তু সকলেই শেষে বলিতেছেন, "কৈ কোথাও ত কিছু খারাপ দেখি না।" অবশেষে সকলেরই আমার মল-মূত্র প্রভৃতির উপর লোভ পড়িল,—কেহ বিষ্ঠা দেখিলেন, কেহ মূত্র পরীক্ষা করিলেন, কেহ রক্ত পরীক্ষা করিলেন,—সকলেরই আশা, এইবার একটা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কীটাণু ধরিয়া সেটাকে টিপিয়া মারিতে পারিলেই ঠাকুরমার গল্পের রাক্ষসীর প্রাণভূত সোনার কৌটার মধ্যস্থ রূপার "ভোমরা-ভূমরীকে" তালপত্রের খাঁড়া দিয়া মাটিতে রক্ত না পড়ে, এমন করিয়া কাটিতে পারিলেই রাক্ষসীর মত আমার দুর্দ্দমনীয় নিস্তেজ মৃদু জ্বরাসুরটাও মারা পড়িবে। হায় হায়! তাহাও কিন্তু হইল না; বীজাণু জীবাণু, কিছুই পাওয়া গেল না। চিকিৎসককুল-ধুরন্ধরেরা সিদ্ধান্ত করিলেন,—"এখনও কিছু ভীষণ ব্যাপার হয় নাই—তবে জমী তৈয়ার হইয়াছে, কখন্ কি ফুটিয়া পড়ে,—তা বলা যায় না।" বেশ কথা, আমি তাহাতেই রাজি। জ্বর মহাশয় কিন্তু এসব কিছুই গ্রাহ্য করেন না,—বেলা ১০টায় আসিতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১২॥০টায় চলিয়া যান,—তাঁর প্রীতি অশেষ, কোন-কিছুতে বাধা মানেন না। এ প্রীতি কোন দিন নিঃশেষ হইবে কি না, "প্রশ্ন ইহাই এখন (That is

the question)," স্থির করিলাম। জ্বর Typhoid, Typhus, malarial, সান্নিপাতিক, দ্ব্যহিক, পৈত্তিক, বিষম প্রভৃতি পুরাতন নাম ত্যাগ করিয়া এবার "চিকিৎসক-মুদ্গর" নাম হইয়াছে। বেশ আছি,—ছ'মাসের রোগী আমি বেশ আছি;—লোকে বলিতেছে 'কুগ্রহে ভোগাইতেছে।' আমি দেখিতেছি, আমার এখন নবগ্রহ তুঙ্গী হইয়া পরস্পর মিত্র কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়া পূর্ণমাত্রায় ফল দিতেছেন—ধন্যবাদ করি ভগবানকে। লোকের মতে আমার যখন ভাল সময় ছিল, আমি কিন্তু তখন "তৈলেন্ধনবস্ত্রাশনচিন্তয়া"—দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮।২০ ঘণ্টা টো টো করিয়া ঘুরিতাম,—তখন দয়া করিয়া দৃষ্টি করিতেন—স্বয়ং মঙ্গলময়ামঙ্গল, ফলে ঋণ বাড়িত; আর রবি ঠাকুরটী, ফলে শরীরটা অবসাদে, পরিশ্রমে, দুশ্চিন্তায় আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগে পীড়িত হইয়া পড়িত! এখন সে তুলনায় চমৎকার আছি—দিব্য আছি,—দিব্য দুগ্ধ-ফেননিভ সুকোমল শয্যায় শুইয়া আছি,—বয়ঃস্থ পুত্রকন্যারা পা টিপিতেছে, গায়ে হাত বুলাইতেছে, বাতাস দিতেছে,—কাশ ফেলিতে মুখ বাড়াইলে পাঁচখানা হাত পিকদান আগাইয়া দিতে অগ্রসর হইতেছে।—ঘরটা মুহুর্মুহুঃ ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত হইতেছে! হাল্‌সীবাগানের তেলের কলের, চামড়ার দোকানের, মিউনিসিপ্যাল্ পেল ডিপোর (বিষ্ঠা ঢালিবার আড্ডার) পচা ও মরা জীবজন্তুর দেহপূর্ণ শকটশ্রেণীর এবং মিউনিসিপ্যাল্ আবর্জ্জনার গাড়ীর চার-পাঁচটা ট্রেণের দুর্গন্ধে কষ্ট না হয় বলিয়া, স্ত্রী দু'দিকে দু'খানা রুমালে গোলাপী ও বকুলের আতর মাখাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। পরম কল্যাণময়ী ইষ্টস্বরূপিণী জননীদেবী মাঝে মাঝে আসিয়া (কেন না, আমার ছেলে-পিলেগুলার ভার তাঁহার ঘাড়ে, সেগুলাকে

খাওয়ান, নাওয়ান, দেখা-শুনা, গৃহস্থালীর গৃহিণীপনায় তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অনেকটা সময় যাইতেছে, তাই মাঝে মাঝে আসিয়া) আমার গায়ে সর্ব্বারামপ্রদ, সর্ব্বরোগ-মুক্তিপ্রদ, পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিতেছেন !—বল ত, এমন সুখের শয়ন, এমন তৃপ্তির সেবা, এমন প্রার্থনীয় রোগ-যন্ত্রণা,—শুভগ্রহের ফলে, না কুগ্রহের ফলে ঘটে ! তাই বলিতেছিলাম, ছয় মাসের রোগী আমি বেশ আছি ! তারপর আহার,—কেমন খাইতেছি,—বেদানা, আঙ্গুর,—যাহা সুস্থ বেলায় চক্ষে দেখিতে পাইতাম না,—সিন্দূরিয়াপটিতে আসিবার সময় যদি কোন দিন লোভ বশতঃ কিনিবার কথা মনে উঠিত, অমনি পাওনাদারের মুখ মনে পড়িয়া সঙ্কুচিত হস্ত আরও ক্ষুদ্র হইয়া যাইত,—আজ তাহাই প্রত্যহ, আর প্রায় একবাক্স খাইতেছি, দিব্য চা, দিব্য গব্যঘৃতপক্ক মোহনভোগ, দিব্য খাঁটি মাখন ও বলকা দুধে জলযোগ করি ! মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সূক্ষ্ম পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, গব্যঘৃত, লেবু, ঘৃতভর্জ্জিত পটোল, বেগুন, ঘৃতপক্ক মুগের দাল, ঘৃতপক্ক ক্ষুদ্র রোহিতমুণ্ড, পুরাতন আমসত্ত্বের ঝোল, গব্য খাঁটি দুধ আহার করিতেছি। বৈকালে দুধে-সিদ্ধ সুজির পায়স জলযোগ চলিতেছে। রাত্রিতে আবার সুজির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রুটি, তরকারী, মাছ ও দুধ।—কাকিমা, মা, স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূর প্রাণপণ যত্নে এই সকল অমৃতোপম দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়,—সকলেই জানেন, রোগীর খাবার, মুখে অরুচি, সাধারণ লোকের জন্য যে যত্নে আহার্য্য প্রস্তুত হয়, তার অপেক্ষা বেশী যত্ন করিয়া প্রস্তুত করা হয় !—ভাব দেখি, আহারে এতটা সুখ তুমি আর কখনও পাইয়াছ কি ?—সেই মা, সেই স্ত্রী, সেই তুমি—কিন্তু ভয়ে, যত্নে পরিশ্রমে, এখন যে সেবাটা পাইতেছ, সেটা কি সুস্থ অবস্থায় আর কখনও

পাইয়া থাক, না, কোন বড়লোক নিত্য কালিয়া-পোলাও খাইয়াও এত সুখ পাইয়া থাকেন?

তারপর সংসার—দিব্য চলিয়া যাইতেছে, কেহ ত উপবাস করিতেছে না! আর আমি যখন খাড়া ছিলাম, তখন প্রত্যহ 'নাই' আর 'আন' শত সহস্রটা শুনিতে শুনিতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ছাতা-ঘাড়ে ঘুরিতে বাহির হইতাম, আর রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিয়া কত অভাব, কত অভিযোগ, কত ত্রুটি শুনিতে শুনিতে বিছানায় যাইতাম! তার উপর পাওনাদারের "বাবু বাড়ী আছেন গা!—আজ পাঁচ মাস একটা পয়সা দিলে না, তুমি কেমন ভদ্রলোক গা,—তবে এই বলে যাচ্ছি, সোমবারে খরচা জমা দেব"—ইত্যাদি মধুর আপ্যায়ন শুনিতে শুনিতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত, আর এখন!—এখনও তাঁহারা আসেন,—দাসী বা বালক-বালিকার মুখে "বাবুর আজ পাঁচ মাস বড় অসুখ" শুনিয়া অনেকে নির্ব্বাক্ চলিয়া যান, কেহ কেহ বা অনুগ্রহ করিয়া বলেন, "অসুখ হয়েছে ব'লে কি আমাদের টাকা দিতে হবে না,"—"অসুখ হয়েছে তা বাড়ী-ভাড়ার কি?"—ইত্যাদি। তথাপি যেন সব শান্ত—ধীরভাবে চলিয়া যাইতেছে; যেন ভূতে সব নির্ব্বাহ করিতেছে! দু'একটী বন্ধুবান্ধব কেবল প্রীতির খাতিরে আমার নিজের হাতে কিছু কিছু "বেদানা মিছরির" খরচও দিয়া যান, তদ্ভিন্ন আয়-ব্যয়ের আর কোন খবরও আমার রাখিতে হয় না। যদিও এখানে প্রয়োজন নাই এবং যে বন্ধু-বান্ধবেরা এমনভাবে আমার সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদেরও কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি এইখানে আমি তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি,—করিতেছি কেবল ইংরেজ-রাজত্বে ইংরেজি পড়ার গুণে, অল্প-

বিস্তর ইংরেজি ভদ্রতার অনুকরণ-দোষে,—নতুবা তথানাম 'এটিকেটে' দোষ পড়ে বলিয়া,—আমার দুনিয়াদারীতে খুঁত থাকিয়া যায় বলিয়া,—নচেৎ আমাদের সামাজিক প্রথায় কাকপক্ষীর নিকটেও এ কথা প্রকাশ করা উভয়পক্ষের অনিষ্টকর। অলমতিবিস্তরেণ। এখন বল দেখি,—সেবায় শুশ্রূষায়, আহারে বিহারে, ভোগে এমনটা কতগুলা গ্রহের শুভফলে ঘটে?

তার পরের কথা—যদি সবশেষের কথা ধর, আমার যদি ইহার পরিণামে থিয়সফিষ্ট বন্ধুদিগের ভাষায় বলিতে গেলে "another plane"এ যাইতেই হয়, তাহা হইলে সে ত সকল ভবযন্ত্রণার শেষ; তবে আর এ অবস্থায় লোকে আত্মীয়-স্বজনে, বন্ধু-বান্ধবে এত কাতর, এত উদ্বিগ্ন কেন? এতগুলা স্পষ্ট সুখভোগের লক্ষণ দুর্লক্ষণ আর কুগ্রহের ফল বলিতে কেহ দ্বিধা করে না বলিয়াই বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট প্রতীয়মান জগৎটাকে 'মায়া' বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। রহস্যটা ঠিক হইল কি না, বন্ধুবর হীরেন্দ্রনাথ বিচার করিবেন।

২

এই রোগশয্যার সুখশয্যায় পড়িয়া মনটাও কত উদ্ভট কল্পনা লইয়া ব্যস্ত হয়। দু'একটা বলিলে পাঠকদের মজা লাগিতে পারে। এখন দিনরাত ডাক্তার-বৈদ্য লইয়াই সৎসঙ্গ করিতে হইতেছে, কাজেই প্রথমেই বৈদ্যদের কথাটা মনে উঠিল, সেটা বেশ হাস্যকর। বৈদ্যরা কে? ভারতের কোথাও বৈদ্য নাই। কেবল বাঙ্গালাই দাশগুপ্ত, করগুপ্ত, ধরগুপ্ত, নন্দীগুপ্ত প্রভৃতিতে ভরা; বর্ণসাঙ্কর্য্যের ফলে যত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কোথাও বৈদ্য জাতির অস্তিত্ব নাই। এমনটা কেন? অন্যত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থই আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী। ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের বেতন ছিল না, রোগ আরোগ্য হইলে পুরস্কার ও প্রণামী ছিল—রহস্যটা উদ্ভেদের জন্য মনটা ভাবিতে লাগিল,—নানা তর্ক-বিতর্ক উঠিল,—পরিশেষে মীমাংসাও হইল যে, হিন্দুর আমলে বেদাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ দ্বিজাধিকারে ছিল। তারপর বৌদ্ধাধিকারে যতি-শ্রমণ-ভিক্ষুরা যখন আতুরের সেবা, রোগীর সেবা, অনাথের সেবার ভার গ্রহণ করিল,—বিহারে পীড়িত পশুপক্ষী ও মানবের শুশ্রূষাগার স্থাপিত হইল, রোগ-পরিচর্য্যা, আর্ত্ত-পরিত্রাণ যখন যতিধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল, তখন গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদি আয়ুর্ব্বেদ ত্যাগ করিবার অবসর পাইলেন। গৃহীর দুঃসাধ্য কতকগুলা বহুফলপ্রদ ধাতুঘটিত তন্ত্রোক্ত ঔষধ এই সময়ের এই সকল যতি-শ্রমণ-

ভিক্ষুরা প্রস্তুত করিয়া দুরারোগ্য রোগে ঐন্দ্রজালিকের ক্রিয়া দেখাইতে লাগিলেন। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ, তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-চিকিৎসা ও ঔষধ-চিকিৎসায় পারদর্শী যতি-সন্ন্যাসীর আদর এই সময়ে বহু রোগের আকর বঙ্গদেশের গৃহস্থগণের নিকট সাতিশয় বাড়িয়া গেল। অশোকাদি রাজগণের ব্যবস্থায় রাজব্যয়ে সকলকে ঔষধ বিতরিত হইত। সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধের মূল্য লওয়া যতি-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষে অন্যায় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত, কাজেই ক্রমশঃ পূর্ব্বকালের খরচ দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া দ্বিজ চিকিৎসক দেখান বন্ধ হইয়া গেল। সন্ন্যাসী চিকিৎসকের আদর গৃহদেবতারও অধিক হইয়া উঠিল। তারপর কালে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইল, একদিনে শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত ৮৪ হাজার বৌদ্ধ বিনাশ করিলেন। সেই বিপ্লবের দিনের সমস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রজা প্রাণ দিয়া একদল অতি প্রয়োজনীয়, সমাজের পরম উপকারী লোকের প্রাণ রক্ষা করিবার উপায় করিল। বৌদ্ধ চিকিৎসকগণই এই দলে। ইঁহারা হিন্দুর অত্যাচারে হিন্দুর আশ্রয়ে লুকাইয়া কোন মতে "মুই হাঁড়" বলিয়া পার পাইলেন। বৌদ্ধধ্বংসকারী হিন্দুরাজারাও প্রজার স্বাস্থ্য-রক্ষার খাতিরে এ দিকটায় একটু চোখ মুড়িয়া হাত গুটাইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ বৌদ্ধ যতিরা যে মান-সম্ভ্রমের উপরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার অনুপাতে ব্রাহ্মণের নিম্নে অন্য শ্রেষ্ঠ জাতির সমানাসনে হিন্দুর জাতিমালায় স্থান গ্রহণ করিলেন। বৌদ্ধ-বিপ্লবে অনেক নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে! পরে ক্রমশঃ বৌদ্ধ শব্দ হইতে বোধ বৈদ নাম হইল—শেষে আবার তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া 'বৈদ্য' করা হইল। তাহার পরে বৈদ্য মহাশয়েরা দেববৈদ্য

দেবশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি প্রভৃতিকে ধরিয়া আপনাদের গোত্র স্থির করিলেন। দেববৈদ্য ক্ষত্রিয় দিবোদাসের গোত্র কেহ গ্রহণ করিলেন না, বরং শক্তি, পরাশর, অত্রি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-ঋষির গোত্র গ্রহণ করিলেন। আয়ুর্ব্বেদের অধিকার ও ব্রহ্ম-গোত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তখন হইতেই হয় ত যজ্ঞোপবীতটা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাই আজ পণ্ডিত উমেশ বিদ্যারত্ন গুপ্তশর্ম্মা লিখিয়া বৈদ্য-ব্রাহ্মণত্বের প্রামাণ্য উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গুপ্ত উপাধিটাও বোধ হয়, বৌদ্ধত্ব গোপনের শেষচিহ্ন-স্বরূপ সমাজশাসনে বা রাজশাসনে হয় ত ধারণ করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণের মধ্যে বাঙ্গালার ক্ষত্রিয়স্থানীয় কায়স্থগণের যাবতীয় উপাধি—দাস, কর, ধর, নন্দী, গুপ্ত, ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া রাজার বা সমাজের শাসনযুক্ত গুপ্ত উপাধিটা তাহার সঙ্গে জুড়িয়া লইয়া আপনাদের বৈদ্যত্ব অথবা লুপ্ত বৌদ্ধত্বের পরিচয় দিবার চিরব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। এই মীমাংসা করিয়া মন এইখানে আসিল। কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ভায়া বলিয়াছেন, এটা আমার জীর্ণ-জ্বর-সংক্রান্ত অবসন্ন মনের একটা প্রলাপ মাত্র, কেন না ধন্বন্তরি হইতে তাঁহাদের কুল জীবিত আছে।—'তথাস্তু'।

৩

একদিন মনে হইল,—বাঙ্গালীর এত অজীর্ণ, অম্ল, প্রস্রাবের পীড়া কেন? মন ভাবিতে লাগিল। মীমাংসাও হইল,—দেশোচিত ব্যবস্থা বিদেশীয় রাজ-ব্যবস্থায় উল্টাইয়া গিয়াছে। দেশে নিয়ম ছিল,—প্রাতঃস্নান, প্রাতর্ভ্রমণ, ফুলতোলা, সন্ধ্যাহ্নিক জন্য দেবালয় ও নদ্যাদিতে গমন; পরে বিষয়-কার্য্য; পরে মধ্যাহ্নে বাড়ী আসিয়া মধ্যাহ্ন-স্নান, মধ্যাহ্ন-ভোজন, মধ্যাহ্নে বিশ্রাম; পরে বৈকালিক বিষয়-কর্ম্ম; তৎপরে সূর্য্যাস্তের পর আবার সন্ধ্যায় পূজা, দেবদর্শনাদি উপলক্ষে ভ্রমণাদি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা। ইংরেজ-রাজত্বের প্রথমাবস্থায় এই নিয়ম বাঙ্গালা দেশেও ছিল। লর্ড ক্লাইব হইতে ব্ল্যাকওয়ার সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পর্য্যন্ত দিনে দু'বার কাছারি করিতেন। পশ্চিমাঞ্চলে 'লু'র ভয়ে এখনও এ ব্যবস্থা আছে। কাজেই সেখানে স্বাস্থ্য এ দেশের মত দূষিত হয় নাই। এখানে আফিস, কুঠি, আদালত, হাট, বাজার, দোকান, বন্দর প্রভৃতি সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যের কাল হইয়াছে—মধ্যাহ্নকাল। সূর্য্য যত তীব্র হইয়া উঠিতে থাকেন, লোকের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম তত বাড়িতে থাকে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সুক্ষুধার সময় আহার না করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে আহার করিয়া মোজা, জুতা, গেঞ্জি, কামিজ, চাপকান, চোগা, উত্তরীয় পরিয়া শরীরকে আহারের অব্যবহিত পরে নানা কাপড়ে ডাকের পুলিন্দায় বোঝাই করিয়া আফিসে লইয়া যাইতে হয়,

আর রৌদ্র-বৃদ্ধির সঙ্গে পরিশ্রম-বৃদ্ধি ও বস্ত্ররাশির গরমে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া প্রভুর তাড়না ও পরিশ্রমের অবসাদ সহিতে হয়। পরিপাক-যন্ত্রটা তখন যে কিরূপ উদ্বেলিত থাকে, তাহা স্বাস্থ্য-দর্শক শারীরতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার মহাশয়েরা বিচার করিবেন। রাত্রির আহারেও ঐ গোল। সারাদিনের ঐ পরিশ্রমের পর প্রকুপিত পিত্ত ও অম্লের পর রাত্রির আহার বিষ হইয়া উঠে!—কাজেই বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর Indigenous disease হইয়াছে,—অজীর্ণ, উদরাময়, গ্রহণী, কোষ্ঠবদ্ধতা। নিম্নশ্রেণীতেও তাই। পরমিটের ধারে দু'টার সময় জলের কলের ধারে যখন মুটিয়াদিগকে জলে গুলিয়া লবণ ও লঙ্কার সাহায্যে ছাতু খাইতে দেখা যায়, তখন বুঝা যায়, নিম্নশ্রেণীতে ওলাউঠা এত বাড়ে কেন? স্বাস্থ্যের ধারণাও বদ্‌লাইয়াছে; বিছানার গরম হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে নিউমোনিয়া হইবার আশঙ্কায় বেলা ৯টা পর্য্যন্ত গায়ে জামা থাকে, অথচ দেশের নিয়ম ছিল, গামছা পরিয়া খোলা মাঠে শৌচাদি নির্ব্বাহ করা এবং প্রাতঃস্নান করা। মোজা পায়ে, জামা গায়ে—একটা বিশেষ সর্ব্বনাশের কথা হইয়াছে। এ দেশের প্রাতর্বায়ু স্বাস্থ্যকর, খোলা গায়ে তাহা লাগাইবার ব্যবস্থা, তাহা আর নাই! যে দেশে ৯টা পর্য্যন্ত সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, যে দেশে ৭টা পর্য্যন্ত তুষারপাত হয়, সেই দেশের স্বাস্থ্য-নিয়ম—উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হইয়া প্রাতর্ভ্রমণ করিবে। সে নিয়ম এ দেশে চালাইলে চলিবে কেন? এ দেশে গামছা মাত্র কাঁধে ফেলিয়া দশখানা গ্রামান্তরে গেলেও সভ্যতা-ভদ্রতার হানি ঘটিত না—ইহার কারণ কেহ ভাবে না। পশ্চিমে গ্রীষ্মে ঘাম হয় না, শুষ্ক বাতাসে চর্ম্ম শুকায়, তাই জামা গায়ে দিবার

ব্যবস্থা আছে ; এ দেশে ঘামের জন্য উত্তরীয় মাত্রই ভদ্রতার ব্যবস্থা। পচা ঘামের গন্ধযুক্ত জামা এ দেশে স্বপ্নাতীত ছিল। নিত্য জামা ছাড়িবার ব্যবস্থা করিলেও ভদ্রতা থাকে না ; অর্দ্ধঘণ্টা গাড়ী করিয়া রৌদ্রমধ্যে কোথাও গেলে, ভিজা কোট-কামিজের জন্য এখনও লজ্জিত হইতে হয় না কি? এমনি খুটিনাটি অনেক কথা মনে পড়িল, আর বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় ইউরোপীয় প্রভাবের অপকারিতা সহস্রমুখ হইয়া দেখা দিতে লাগিল।—কতই ভাবিতেছি,—এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন,—"বাবা, কার্ত্তিক মাস,—প্রথম শিশির পড়্‌ছে,—মোজা-জোড়া পায়ে দাও"—স্ত্রীকে বলিলেন,—"বউ-মা, নতুন খোকার গায়ে ফ্লানেল ফ্রক ও পশমের মোজাটা দাও,—সন্ধ্যা হ'য়ে এল, এক মাসের ছেলে,—এখনও পেটের শীতই যায় নি, তায় কার্ত্তিকের হিম!"—হাসিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিলাম। ডাক্তার শুনিয়া বলিলেন, 'that's good'. আমিও বলিলাম,—'তথাস্তু'।

৪

এক সময় মনে হইল, একান্নবর্ত্তী প্রথা আর টিকিতেছে না কেন ?—মন ভাবিতে লাগিল,—মীমাংসাও হইল। পল্লীগ্রামে, গণ্ডগ্রামে, যাঁহারা এখন লেখা-পড়া শিখিতেছেন, তাঁহারা উকিল হউন, ডাক্তার হউন, এঞ্জিনীয়ার হউন, ইস্কুল-কলেজের অধ্যাপক হউন, আর কেরাণীই হউন, গ্রামে থাকিয়া তাঁহাদের অন্ন করিবার উপায় হয় না, কাজেই বাধ্য হইয়া সহরে, নগরে আসিতে হয়। সেকালেও তাহা হইত, কিন্তু একটু প্রভেদ ছিল। সেকালে গ্রাম্য ব্যবস্থা যাহা ছিল, পথ-ঘাটের দুর্গমতা যেরূপ ছিল, পথ-খরচার বাহুল্য যেরূপ ছিল, তাহাতে সহজে লোকে কর্ম্মস্থানে ও বাসগ্রামে যাতায়াত করিতে পারিত না। তখন গ্রাম্য-ব্যবস্থায় ভাগ্যান্বেষী কৃতবিদ্য পুরুষ স্বীয় স্ত্রীকে আনিয়া সহরে বাসা করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহাতে অনেক অসুবিধা ছিল, তন্মধ্যে এখন যেটা অতি সহজ এবং সাহসের কার্য্য হইয়াছে, সেটা সেকালের পল্লীবধূর একা সহরে আসিয়া গৃহিণীর ভার গ্রহণ করাটা বিশেষ অসুবিধা ছিল। কোন গৃহিণীও কিশোরী বা যুবতী বধূ বা কন্যাকে এরূপে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না। তাহাতে হয় ত পাত্রবিশেষে জলপাত্রের ব্যবস্থা হইত বটে, কিন্তু এখনকার মত সে পক্ষে সর্ব্বস্বান্ত হইবার কোন ব্যবস্থা হইত না। কাজেই পিতামাতা, ভ্রাতৃবন্ধু, কোন খাতির না থাকিলেও, নিজের স্ত্রী-কন্যার জন্য একান্নবর্ত্তী সংসারে

ভাগ্যবানকে সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে হইত। তখনকার পল্লীবাসে যশঃ, মান, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভের উপায় স্বতন্ত্র ছিল, কাজেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যশঃকামী হইয়া সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া গ্রামে সম্ভ্রম-শালী হইতেন। তাঁহাকে দেশে পূজাদি উৎসব, পুষ্করিণী, দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শনাদিকালে গ্রামের দশজনকে সঙ্গে লওয়া ইত্যাদি কার্য্য করিতে হইত। এখনকার আত্মদৈবত হইয়া গাড়ীজুড়ী বাগানবাড়ীর ব্যবস্থা করিবার প্রবৃত্তি তখন কাহারও ছিল না! এইরূপে ভাগ্যবানের অর্থে যেমন পাঁচজন আত্মীয়-স্বজন প্রতিপালিত হইতেন, তেমনই প্রতি-পালিতেরাও তজ্জন্য পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি রক্ষায়, চাষ-আবাদ পরিদর্শনে, দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে, বালকবালিকার শিক্ষা প্রভৃতি গৃহকর্ম্মে, গৃহদেবতার সেবায়, শিশুপালনে, ধান চা'ল ঝাড়া-বাছায় আপনারা উৎসাহপূর্ব্বক যোগ দিতেন। তখন ইঁহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা কৃতজ্ঞতা-বৃত্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এই সকল কার্য্য করিতেন, এরূপ জ্ঞান ভ্রমেও তাঁহাদের কাহারও মনে আসিত না। সেকালের কোন খুড়ী, মাসী, জেঠাই বা জ্ঞাতি ভগিনী মনে করিতেন না, "আমি অবীরা, আমার তিনকুলে কেহ নাই, তাই আজ অমুকের গলগ্রহ হইয়াছি, ইহাদের সংসারে না খাটিলে ইহারা ভাত দিবে কেন?" এতটা ভেদবুদ্ধি, স্বার্থজ্ঞান, অনাত্মীয়তা তখনকার সমাজে ফুটিতে পাইত না। যিনি উপার্জ্জন করিতেন, তিনিও ঐরূপই মনে করিতেন,—ইহারা আমার নিজ পিতামাতা, সন্তানসন্ততির ন্যায় অবশ্যপ্রতিপাল্য; ইহাদের অপালনে আমার প্রত্যবায় ঘটিবে, নিন্দা হইবে, পালনে কোন প্রশংসা নাই। তখন কোন ভ্রাতা মনে করিতেন না যে, আমরা পরস্পরকে সাহায্য

করিতেছি; কোন ভ্রাতা মনে করিতেন না যে, আমি অক্ষম বলিয়া আমায় চাষার কাজে মাঠে মাঠে ঘুরিতে হয়, আর উপার্জ্জনক্ষম ভ্রাতা নিজের অর্থ-গৌরবে কর্তৃত্ব করেন। তখন কোন বধূ ওরূপ স্বামীকে উপার্জ্জনক্ষম দেবর-ভাশুরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিজ স্বামীর নিশ্চেষ্টতা, উদ্যমহীনতা, অলসতা, পুরুষোচিত সাহস-হীনতার জন্য অনুযোগ করিতে জানিতেন না। তখন এক পরিবারভুক্ত একান্নবর্ত্তী ঘনিষ্ঠ ও দূরসম্পর্কীয় সকলেই মনে করিতেন—প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন, "এটা আমাদের সংসার"—তখন কোন উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ সাধ্যসত্ত্বেও কেবল নিজের স্ত্রীকে ভাল বস্ত্রালঙ্কার দিবার কল্পনাও করিতে পারিতেন না। গৃহাবস্থিত ভ্রাতৃবধূ ও ভগিনী-ভাগিনেয়ীদিগকে যদি সমান দরের দ্রব্য দিতে পারিতেন, তবেই দিতেন, নতুবা কেবল নিজ স্ত্রী-কন্যাদের দিবার জন্য কিনিতেও দূরদেশে বসিয়া লজ্জানুভব করিতেন। মা, যাঁহার সঙ্গে তুলনা হয় না, একান্নবর্ত্তী পরিবারে পুত্রের আন্তরিক ভক্তিটুকু ভিন্ন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সমপর্য্যায়ের যা, ননদ, ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ বা তাঁহারও গুরুজনসম্পর্কীয় মহিলাগণের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া নিজে পুত্রের নিকট ওরূপ কোন উপহার পাইবার জন্য আশাও করিতে জানিতেন না, বরং কোন ব্যক্তি ভুল করিয়া কেবল মা'র জন্য একখানি গরদ, তসর বা রেশমী নামাবলী আনিলে, মা বলিতেন,—"তুমি অমুক অমুককে এই জিনিস না দিলে, আমি ইহা ব্যবহার করিতে পারিব না। তাহাতে তাহারা পতিপুত্রহীনা—অবীরা, তাহারা যে এখানি দেখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিবে, আমি তাহা সহিতে পারিব না।" কোন মাতা হয় ত তিরস্কার করিয়াই বলিতেন—"তোর কি

রকম বিবেচনা, ঠাকুরঝি—তোর পিসী—হ’লই বা দূরসম্পর্কের—তুই ভিন্ন যখন তাঁর আর কেউ নেই, তোর ছেলেপিলে নেড়ে, তোর সংসারে গতর মাটী ক’রে যে পড়ে রয়েছে,—তুই তাঁর জন্যে না এনে, আমার জন্যে কিন্‌লি কোন্ বিবেচনায় ? সে ত মনে কর্‌বে—পর, তাই দিলে না, আপনার ভাইপো হ’লে কি কখন এমন তুই তুই কর্‌তে পার্‌তো —আমি ত কখন নেব না—তুই ও বিলিয়ে দিগে যা।” কেহ বা এইখানে শান্ত হইয়া বলিতেন,—“বাবা, তুই আমার বেঁচে থাক্, দশজনকে প্রতিপালন কর্—আমার ভাবনা কি ? এটা তোমার পিসীমাকে দাও—নইলে, আহা বেচারী মনে বড় দুঃখ কর্‌বে।—পাঁচজনে খেলে-পর্‌লেই আমার খাওয়া-পরার সাধ মিট্‌বে।”—এই রকম কত ভাব, কত ব্যবস্থা ছিল, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল ; কিন্তু মন যত দ্রুত বহুবিধ ভাবের সমাবেশ করিতে পারে, কলমে তত দ্রুত এবং তত বেশী বর্ণনা করিতে পারিয়া উঠা যায় না এবং লিখিয়া দিলেও “মানসী” ততগুলা প্রলাপের জায়গা দিতে পারিবে না। কাজেই “বুঝ লোক, যে জান সন্ধান”—এখনকার ছেলে-পিলে এ সকল ব্যাপারের ছবি দেখে নাই, গল্পও তাহারা আর বড় শুনিতে পায় না, কাজেই তাহাদের সম্মুখে এ আদর্শ খাড়া করিবার উপায়—এই সকল ব্যাপার লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিয়া তাহাদের পাঠের সুবিধা করা। এখন যাঁহারা ক্ষুদ্র গল্প লেখেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রবীণবয়ঃ, তাঁহারা এরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখ-দুঃখের আস্বাদন পাইয়াছেন বা ভাব গ্রহণ করিয়াছেন বা নিজে দেখার মত বিশ্বাস্য গল্প শুনিয়াছেন, তাঁহারা ইস্কুল-কলেজের যুবক-যুবতীর প্রেমের আরম্ভ, পরিণতি, বিচ্ছেদ, ভ্রম, কলহ, বা সুখ-দুঃখ লইয়া ছোট ছোট

গল্প না লিখিয়া যদি এই সকল বিষয়ে গল্প লেখেন, তাহা হইলে মন্দ হয় না। তাঁহারা এ মুমূর্ষু রোগাতুরের কথাটা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাধিত হইব *। অতীতের আলোচনা ছাড়িয়া মন বর্ত্তমান অবস্থার কারণ, যাহা ভাবিয়া ঠিক করিয়াছে, তাহা এইরূপ :—কোন যুবক কৃতবিদ্য হইয়া ডেপুটী হইল। সে বিদেশে গেল। তিন বৎসর অন্তর তাহার বদলী অনিবার্য্য,—কত দেশে ঘুরিবে। চাকুরীকাল ত্রিশ বৎসর মধ্যে ছুটি ব্যতীত দেশে সে আসিতে পাইবে না, কাজেই দেশের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে, তাহার ঘনিষ্ঠতা গেল,—চিঠিতে-চিঠিতে আত্মীয়তার কথার বিনিময়মাত্র চলিতে লাগিল। এ ব্যবস্থায় যুবক কর্ম্মস্থানে স্ত্রী লইয়া যাইতে বাধ্য হয়, ইহাকে বিদেশে প্রতি স্থানে ভৃত্যমাত্র-সহায়ের তিন বছরের মেয়াদে সংসার পাতিতে হয়। সন্তান-পালনে ও রোগ-শোকের সেবায় বেতন দিয়া লোক রাখিয়া নিঃসম্পর্কীয় লোকের নিকটে মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি কিনিয়া লইতে হয়। 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমী'র মায়া তাহাদের হয় না। অল্প দিনেই এক স্থানের সব ব্যবস্থা, প্রীতি-ভালবাসা ছাড়িয়া অন্যস্থানে গিয়া আবার ঐ সকলের ব্যবস্থা সেই বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এইরূপ ৩০ বৎসর কাল

* নবীনবয়ঃ গল্পলেখকদের এ অনুরোধ করি না। কারণ, তাঁহারা হয় একান্নবর্ত্তিতা দেখেন নাই, নতুবা ধ্বংসোন্মুখ একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভগ্নাংশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল তাহার কুফলগুলিই দেখিয়াছেন। সহরে এখন প্রত্যেক ভ্রাতার স্ব স্ব উপার্জ্জন-ব্যবস্থায় নূতন স্বাধীনভাবে গঠিত এক-গৃহমাত্র-বাসী এক প্রকার একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা দেখা যায়—তাহা ইউরোপীয় হোটেলবাস-প্রথার দুরানুকরণ বলিয়া আমার বোধ হয় ; সেরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার কথা আমি তুলি নাই।

ক্রমাগত চলিতে থাকে। অল্প-বয়সের যুবক-যুবতী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পঞ্চাশদূর্দ্ধ বৎসর বয়সে যখন দেশে ফিরিয়া আইসে, তখন দেশ তাহার অপরিচিত অনাত্মীয় হইয়া পড়ে। দেশ তাহাকে যে ভাবে চায়, তখন সে আপনাকে সে ভাবে দেশের এবং দেশের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে মিশাইতে পারে না,—কাজেই তাহারা—স্ত্রী-পুরুষ, পুত্র-পরিজনের কেহই, সেখানে শান্তি, সুখ, প্রীতি পায় না, ছুটিয়া আসিয়া সহরবাসে,—চিরাভ্যস্ত অনাত্মীয়-শ্রেণীর মধ্যে বাস করিতে প্রবৃত্ত হয়। দেশ ও দেশের সমাজ তাহাদের আত্মীয়তা চায়—আত্মীয়তা না পাইলে বিরক্ত হয়, অত্যাচার করে। এ বিষয়ে ৩০ বৎসরের অনভ্যস্ত পরিবার সে আত্মীয়তার আস্বাদ জানে না, কাজেই করিতেও পারে না, আর দেশের লোকের কাছেও তাহাদের নিজেদের যেটুকু প্রাপ্য থাকে, তাহা উসুল করিয়া লইতেও জানে না। এইরূপ মুন্সেফ, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, ইস্কুল-কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি সকলেই উপার্জ্জনের দায়ে গ্রামচ্যুত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কাজেই গ্রামগুলি জনহীন অর্থাৎ গ্রামের কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান, উন্নতিক্ষম লোকহীন হওয়ায়, উৎসন্নে যাইতেছে; সহর এবং সহরের উপকণ্ঠগুলা সম্বন্ধহীন, আত্মীয়তাহীন লোকসমূহে পূর্ণ হইয়া একপ্রকার বিচ্ছিন্ন ব্যথাহীন, মমতাশূন্য সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে। এ সমাজে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধুর পুত্রমরণেও আমার বাড়ীর বিবাহ-উৎসব বন্ধ হয় না, আমার ভ্রাতার জামাতৃবিয়োগেও আমার বাড়ীর বন্ধুভোজ বন্ধ করা যায় না—আট্‌কায় কোথায় জান ?—মমতায় নয়, আত্মীয়তায় নয়, সম্পর্কে নয়, স্নেহে নয়—‘এটিকেটে’—সভ্যতায়! চাকুরীর অধীন জীবগুলি

ছাড়িয়া দিলে উকীল, কণ্ট্রাক্টর, আধুনিক সভ্যতা ও ভদ্রতার অনুমোদিত ব্যবসাদারগণ কতকটা স্বাধীন হইলেও, তাঁহারাও কালপ্রভাবে এবং একমাত্র অর্থ দৈবত হইয়া পড়ায়, চাকুরীজীবীদিগের অপেক্ষাও বেশী প্রবাসপ্রিয় হইয়া পড়েন। মন ভাবিল,—এরূপে এক গ্রাম ভাঙ্গিয়া অন্যত্র গ্রাম গড়ে না কেন? গড়ে না—সহানুভূতির অভাবে। প্রবাসী বন্ধুরা পরস্পর সকলেই স্ব স্ব গ্রাম, আত্মীয় ভুলিয়া যান, কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেরই চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ চৈতন্য জাগরিত থাকে যে, আমরা কেহ কাহারও আত্মীয় নই, আমরা কেহই কাহারও কেহ নই—কাজেই নিজ গ্রামে বাগদী জেঠা ও গয়লা মাসীকে লইয়া যে আত্মীয়তার বন্ধন পুরুষপরম্পরাক্রমে বাঁধা থাকে, নববাসস্থানে তেমন বাঁধন আর বাঁধা যায় না।—এইরূপ ভাবিয়া মন শান্ত হইল। কোন বন্ধু দেখিতে আসিলে, তাঁহার সহিত এই সকল আলোচনা করিলাম। তিনি একজন প্রবাসী উকীল। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—ওগুলা সংস্কার মাত্র—বসুধৈব কুটুম্বকং—এ উদার নীতিটা এরূপ প্রবাসে বেশ অভ্যস্ত হয়—তোমার এ ভাবগুলা প্রলাপ মাত্র।—আমি বলিলাম, 'তথাস্তু'।

৫

এক সময়ে মনে হইল,—বিধবারা আমাদের সমাজে দিন দিন নিরাশ্রয়া হইতেছে কেন? মন ভাবিতে লাগিল,—মীমাংসাও হইল। একান্নবর্ত্তিতা লোপ যে কারণে হইয়াছে, বিধবার দুর্দ্দশাও সেই কারণে হইতেছে। উপার্জ্জনক্ষম প্রবাসী বিদেশে প্রয়োজনের অনুপাতে দুই চারি জন দাসী-চাকর, রাঁধুনী বামুন বা বাম্‌নী ইত্যাদি রাখিতে বাধ্য হন; কিন্তু অধিকাংশ লোকেই পরিবারস্থা অবশ্যপ্রতিপাল্যা কোন বিধবাকে লইয়া নিজের সঙ্গে রাখিতে পারেন না। অনেক স্থলেই শুনিতে পাওয়া যায় যে, "কি কর্‌ব, পিসী-মাকে আন্‌লে, ঘরে ঠাকুর আছেন,—তাঁর সেবা চলে কি ক'রে?" "জেঠাই-মাকে আন্‌লে কি চলে? তিনিই হলেন, আমাদের সংসারের খুঁটি,—লোকজন, ক্ষেত-খামার, রাখাল, গরু-বাছুর, খাতক-মহাজন—সব তাঁর নখদর্পণে,—আমি ত এই ভবঘুরের চাক্‌রী করি,—তিনি এলে কে সে সব দেখে শুনে?"

"দিদিকে কি আন্‌তে পারিনে? আন্‌লে আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী—ছেলে-মানুষ বউ,—কার কাছে থাকে?—তায় তার ছোট ছোট ছেলে-পিলে, তাহাদেরই বা দেখে কে?"—অনেকে গর্ভধারিণীকে সঙ্গে রাখিতে পারেন না। গৃহদেবতার সেবা, সংসারের ভার, কনিষ্ঠের স্ত্রী-পুত্রাদি, ভগিনীর পুত্র-কন্যাদির প্রতিপালন প্রভৃতি আপত্তি ব্যতীত অনেক গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রামবাসীরা আর একটা নূতন আপত্তি করেন,—"মা গঙ্গা-

স্নান বন্ধ ক'রে, আমার সঙ্গে আস্তে রাজি নন্,"—কোন কোন ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তির আপত্তি—"মা প্রাচীন হয়েছেন, কোথায় কোন্ নি-গঙ্গার দেশে নিয়ে গিয়ে কি তাঁর শেষ দশাটায় গঙ্গাটুকুও পাবার পক্ষে হন্তারক হব ?" —ইত্যাদি। তারপর যাঁর বিদেশে—প্রবাসে পদোচিত সম্ভ্রমরক্ষার্থ খরচ বাড়িয়া যায়, বা ষষ্ঠীর অনুগ্রহে খরচ বাড়ে,—তিনি ক্রমশঃ দেশের বাড়ীতে মাসিক অর্থ-সাহায্য কম করিতে থাকেন। এইরূপে বিধবারাই সর্ব্বাগ্রে অন্নবস্ত্রের ক্লেশে পড়েন। যাঁহাদের পৈতৃক সংসার, পৈতৃক সম্ভ্রম, পৈতৃক ঠাকুর এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীর জঞ্জাল নাই, তাঁহারা হয় ত কেহ কেহ দু'একটি বিধবাকে সঙ্গে রাখিতে বাধ্য হন,—সেখানে যুবতী গৃহকর্ত্রীর অবিবেচনা অনেককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। অনেক স্থলে এই সকল আপত্তি কেবল ওজর মাত্র না হইতে পারে—সম্পূর্ণ সৎকারণ-সঙ্গত যুক্তিও হইতে পারে; কিন্তু তাহার জন্য ফলাফলের তারতম্য ঘটে না। ফলকথা, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিবর্ত্তন হওয়াতে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা উল্‌টাইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী স্পষ্টকথায় বলে না বটে যে, প্রতিপাল্যগণকে প্রতিপালন করিও না; কিন্তু এমনভাবে স্বাবলম্বন ও আত্মতৃপ্তির চেষ্টা করিতে শিক্ষা দেয় যে, তাহাতে অন্যদিকে চাহিবার অবসর ও সুযোগ হয় না। এখনকার শিক্ষা কিন্তু ইহা স্পষ্ট বলে, তুমি বেশী রোজগার কর, তোমার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা বেশী সুখৈশ্বর্য্য-বিলাসভোগের ন্যায়তঃ অধিকারী, —তোমার কনিষ্ঠ সহোদর ও অবশ্যপ্রতিপাল্যা বিধবারা সাহায্য-হিসাবে কিছু পাইতে পারেন। সে কালের শিক্ষায় ও সমাজ-ব্যবস্থায় কিন্তু তাহা ছিল না। তখন কাহারও ঘরে স্বচ্ছলতা থাকুক, আর না থাকুক, সে

মনে করিত যে, "আমার পিসতুতো ভগিনীর কন্যা নিরাশ্রয়া হইয়াছে, আমি থাকিতে সে কোথায় যাইবে,—তাহাকে না আনিলে আমার অপ-কর্ম্ম করা হইবে।" এখন এতটা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের জন্য এমন-ভাবে কেহ ভাবিতে শিখে না। ইহাকে শিক্ষার দোষই বলিব বই কি! কোন আত্মীয়া উপযাচিকা হইয়া আশ্রয়প্রার্থিনী হইলে আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে শিখিয়াছি, "তিনটে ছেলের লেখাপড়া, চার্‌টে মেয়ের বিবাহ আছে, দু'টো দাসী-চাকর রেখেও আমায় চল্‌তে হয়, এর উপরে আর তোমার ও তোমার শিশুসন্তানের ভার নিতে পারিনে।" তখন এ রকম কথা বল্‌বার আগে কর্ত্তা ভাব্‌তেন,—"আহা! অদৃষ্টদোষে আজ ও আমার দ্বারে দু'টো অন্নের জন্য এসেছে,—যতক্ষণ আমার দু'বেলা চল্‌বার উপায় আছে, ততক্ষণ কি ক'রে বল্‌ব যে, "হবে না।" গৃহিণী ভাব্‌তেন—"আহা! ও একটা ঘরের ঘরণী-গৃহিণী ছিল, ওই একদিন হাতে ক'রে দশজনকে দশমুটো দিয়েছে, আজ কপাল মন্দ হয়েছে বলেই ত, আমার কাছে এসেছে,—আমার ছেলেপিলে যখন দু'বেলা খেয়ে আঁচাচ্ছে, তখন কি ক'রে বল্‌বো যে—হবে না। বিধবা মানুষ, এক বেলা দু'মুটো ভাত ছাড়া আর ত বেশী কিছু খাবে না—ছেলেটা ত পাঁচ পাতের ফেলা-ভাতে মানুষ হবে; আর বছরে থান-চারেক কাপড়—এই ত! আরও, তায় ও কি আমাদের পর?—আমার দাদা-শ্বশুরের ভাগ্‌নীর মেয়ে,—আপনার জাতকুটুম,—যখন আমরা ছাড়া ওর আর নিকট-সম্পর্কের কেউ নেই,—তখন আমরা যদি ওকে আশ্রয় না দি, ওকে অজাতে যেয়ে দাঁড়াতে হবে,—তাতে কি আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে?" এখন এরূপ ঘটনা হ'লে গৃহিণী "সখী-সমিতির" ও "মহিলা-শিক্ষাসমাজের" বিশেষ

আবশ্যকতা ও দূরসম্পর্ক বাঁধাইয়া লোকে কেমন করিয়া পরের গলগ্রহ হইবার চেষ্টা করে,—সেই বিষম অবিবেচনার বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন। ইহাও শিক্ষার দোষ ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। ইহার আর একটা দিক্ আছে,—অনেকে উপকারকের আশ্রয়ে তাঁহাদের মন জোগাইয়া চলিতে পারে না,—ইহাও দোষের বটে, কিন্তু সে দোষও শিক্ষার, সমাজ-ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনের। সেকালে বিধবারা যুবতী আশ্রয়-দাত্রী বধূর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন,—"ওমা তুমি আমার অমুকের বউ, তুমি উননশালে রেঁধে কষ্ট পাবে, আর আমি বুড়োমাগী ব'সে ব'সে তাই দেখ্‌বো, আর কচি ছেলের রাঁধা ভাত মুখে তুল্‌বো।"—এখন এরূপ স্থলে কেহ কেহ হয় ত বলেন,—"ওমা, কপাল মন্দ হয়েছে বলেই ত তোমাদের আশ্রয়ে এসেছি,—তাই বলে কি তোমাদের আদাড়-হেঁসেল ঠেলে দাসীবৃত্তি ক'রে দু'টো ভাত খেতে হবে?—আর, উনি হেঁসেলের ধারেও যাবেন না,—আমিও একদিন একটা সংসারের গিন্নী-বউ ছিলেম গো।"—এই উত্তরও এখনকার কালের "আত্মসম্ভ্রমের" সচকিত জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, কাজেই শিক্ষার দোষ ভিন্ন আর কি বলিব?—সমাজ-ব্যবস্থা উল্‌টাইয়া গিয়া এই সকল উৎপাত ও আপদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং দিন দিন পিসীমা-মাসীমাদের জন্য প্রাইভেট্ টিউশানের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিতেছে, সপুত্রা বিধবা খুড়ীরা ভাগিনেয়ীর জন্য বন্ধুর সন্তানকে স্তন্য দিয়া অন্নসংস্থান করিয়া দেওয়াটা ডেপুটী-মুন্সেফদিগের কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িবে দেখিতেছি। মন বিরত হইল। এমন সময় মাতা-ঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন, "আহা বাবা, এতদিনে বিমলার একটা হিল্লে লাগ্‌লো—

ন-ঠাকুরঝি, ননদের বাড়ীতে রাঁধুনী ছাড়িয়ে দিয়ে তাকে রেখেছে। সে দু'টো রেঁধে দেবে, খাবে পরবে, আর থাক্‌বে,—আহা ছুঁড়িটে কচি মেয়েটার হাত ধ'রে এদ্দিন পথে পথে বেড়াচ্ছিল!—এই বিমলা আমাদের পাড়ার চৌধুরীদের বাড়ীর বউ। তাহার এক খুড়তুতো দেবর মুন্সেফ, তাহার ছয়টি সন্তান, কাজেই তিনি আর জেঠ্‌তুতো ভ্রাতার স্ত্রী-কন্যাকে প্রতিপালন করতে অক্ষম! তাঁহার বাসায় কিন্তু তিনটা ছেলের ঝি, একটা রাঁধুনী বাম্‌নীও আছে। শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, "হে ভগবান্, তোমার যেমন ইচ্ছা,—তাই ত হবে!"

৬

একদিন মনে উঠিল,—কেরাণীর ছেলের লেখাপড়া হয় না কেন? মন ভাবিতে লাগিল,—দেখিলাম, বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্য হওয়ায়, আমাদের সমাজে থাপ থাইতেছে না। সেকালে গ্রামের গুরু-মহাশয় বালকদিগের নিকট বেতন পাইতেন না, জমীদারের বা ছেলেদের প্রদত্ত বস্ত্র, সিধা ও পার্ব্বণিতে নিজের অভাব মোচন করিয়া বিদ্যাদান করিতেন,—সে বিদ্যায় গৃহস্থ-সন্তানেরা তখনকার অর্থকরী বিদ্যায় মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিয়া আপনাকে নিজের জাতীয় ব্যবসায় বা জমীদার-সরকারে মুহুরিগিরি হইতে নায়েবী পর্য্যন্ত করিয়া নিজের সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত। সকলেই উচ্চশিক্ষার দাবী করিত না, করা উচিতও মনে করিত না। তখনও উকিল, মোক্তার, বৈদ্য, হাকিম, আমীন, দালাল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের শিক্ষাও ছিল। যাহাদের পারিবারিক ব্যবস্থায় সেরূপ শিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনা থাকিত, তাহারাই সেই সকল শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইত; সমাজও মনে করিত না যে, সমাজের আচণ্ডাল সকলকে উচ্চশিক্ষা দিবার সুযোগ করিয়া দিয়া, অর্দ্ধশিক্ষায় বা কুশিক্ষায় স্ব স্ব সংসার ও জাতিব্যবসায়-পরিচালনে কতকগুলা অপরিপক্ক অকর্ম্মণ্য যুবক সৃষ্টি করিতে না পারিলে কোন দোষ হয়,—বা তাহাতে সমাজের ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণদিগের দুষ্ট স্বার্থবুদ্ধির পরিচয় ও ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের অকারণ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ

পায়। এখন সে ব্যবস্থা নাই,—এখন সকলেই ছেলেকে আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত উচ্চশিক্ষা দিবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ছেলের বর্ণপরিচয়কাল হইতে বিপথে চালিত করে। সহরের একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার কেরাণীরই কথাই দেখা যাক্। কেরাণী পিতা, সহরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন; পোষ্য স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও একটি দাসী লইয়া আটটি —বৃদ্ধা মাতা, নিজে, স্ত্রী, দুই কন্যা, দুই পুত্র, এক দাসী। পুত্রদুইটি সহরের ব্যবস্থায় হাই ইস্কুলে পড়ে;—একটি ৪র্থ শ্রেণীতে, একটি ২য় শ্রেণীতে। কেরাণী বাবুটি সওদাগরী আপিসে ৫০্ টাকা মাহিনা পান। —বাড়ীভাড়া ২০্টাকা দেন,—ছেলেদের ইস্কুলের মাহিনা ৬্টাকা যায়। নিজে বেলা নয়টার সময় খাইয়া আপিসে যান,—রাত্রি ৮টায় বাড়ী আসেন,—দুই বেলার মধ্যে এক বেলাও নিজে ছেলেদের লেখা-পড়ায় সাহায্য করিতে সময় পান না; আর নিজের বিদ্যাও এখনকার ইস্কুলের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য করিবার মতও নহে,—কাজেই পুত্রগণের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহাকে একটি বি-এ পাশ-করা গৃহশিক্ষক ১০্টাকা বেতন দিয়া ২ ঘণ্টার জন্য নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। দাসীর মাহিনা ৩্টাকা দিতে হয়,—ছেলেদের টিফিন-খরচা ৵১০ পয়সা হিসাবে দু'জনকে ২্টাকার বেশী দিতে পারেন না,—এইরূপে নির্দ্দিষ্ট বাঁধা খরচে কেরাণী বাবুর ৪১্টাকা যায়, তারপর ৮টি লোকের এক মাসের খোরাক, পোষাক, দুধ, ডাক্তার, ঔষধ ও পথ্যের জন্য মাত্র ৯্টাকা অবশিষ্ট থাকে। অর্থের অসচ্ছলতার কথা আমি ভাবিতেছি না,—ভাবিতেছি যে, কেরাণীর এরূপ আয়, তাহার পক্ষে ছেলেদের শিক্ষার জন্য মাসিক ১৮৷২০্টাকা ব্যয় করা উচিত কি না? পুত্রসংখ্যা বেশী

হইলে সেখানে দুর্দ্দশা আরও বেশী!—সুতরাং এ শিক্ষা বেশী দিন চলে না। অনেক মেধাবী বালককেও পিতার সাহায্যের জন্য ৩য় বা ৪র্থ শ্রেণী হইতেই শিক্ষাদ্বারে বিদায় লইতে হয়। শৈশব হইতে উচ্চশিক্ষার উপযোগী সাহায্য রীতিমত কেরাণী পিতা যোগাইতে পারেন না, কাজেই প্রকৃতপ্রস্তাবে ৩য়।৪র্থ শ্রেণীর শিক্ষাও তাহাদের সম্পূর্ণ হয় না। সে-সকল ছেলে ১৮।২০ বৎসর বয়সে নিজের শিক্ষিত বিদ্যার সাহায্যে কি উপার্জ্জন করিতে পারে? যে সকল পথে উপার্জ্জন, তাহার কোন পথেই তাহারা এই ২০ বৎসর কাল হাঁটিতে পায় নাই,—তাহাদের অপরাধ কি? কেরাণী পিতা প্রত্যূষে উঠিয়া, চাকর অভাবে নিজেই হাটবাজার করিতে বাধ্য,—তারপর নাকে-মুখে দু'টো ভাত গুঁজিয়া আপিস যান,—সেখানে পরিশ্রমের সঙ্গে প্রভুর মিষ্টবচন হজম করিয়া সন্ধ্যা জ্বালিবার পর আপিস ছাড়িয়া বাড়ী আসেন। তখন পরিশ্রান্ত অবসন্নদেহে বিশ্রাম ভিন্ন দুনিয়ার আর কিছু ভাল লাগে না। নিজের বিদ্যা থাকিলেও এরূপ অবস্থায় অনেকে আবার পুত্রগণের সাহায্যে অপারগ হন। সেকালে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা অন্যবিধ ছিল,—সংস্কৃত-শাস্ত্রশিক্ষা পাইতে হইলে, ছাত্রগণকে অধ্যাপকের গৃহে গিয়া বাস করিতে হইত। চিকিৎসা-বিদ্যার জন্যও ছাত্রগণকে কোন কবিরাজ মহাশয়ের বাসায়, উকীল-মোক্তারী শিক্ষার জন্য সহরে উকীল-মোক্তারের বাসায় গিয়া থাকিয়া শিখিতে হইত। সুতরাং শিক্ষার ষড়্‌বিধ উৎপাত (স্বগৃহবাস, শ্বশুরগৃহবাস, কুসঙ্গ, ব্যসন, গীতবাদ্যানুরক্তি ও আলস্য) তাহাদের স্পর্শ করিতে পারিত না। বিদ্যা-শিক্ষার গ্রন্থক্রয়াদিজনিত বিপুল অর্থব্যয় তখন ছিল না। তবে কিছু

সময় লাগিত। যাহারা সে সময় দিতে না পারিত, তাহারা সে দিকে যাইত না। দেখিতে গেলে বিনাব্যয়েই উচ্চশিক্ষা লাভের প্রশস্ত উপায় তখন ছিল। ছাত্রপক্ষ হইতে এইটুকুই দেখিবার ও বিবেচনার জিনিস। অধ্যাপকেরা ও গুরু-মহাশয়েরা কিরূপে প্রতিপালিত হইতেন, সে স্বতন্ত্র কথা।—কাজে দেখা যাইতেছে,—উচ্চশিক্ষার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া আচণ্ডালে বিদ্যালাভের সুবিধা করা হইয়াছে, এই মধুর কল্পনা ব্যতীত দেশের ও সমাজের কোন সুবিধা হইয়াছে কি না, তাহা ভাবিবার সময় এখন না আসিয়া থাকিলে, কবে আসিবে, তাহা ত জানি না। কোন ব্যবসায়-শিক্ষাহীন ইস্কুল-কলেজে সাধারণতঃ উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু যুবকবৃন্দের উপার্জ্জনের কোন শিক্ষা হইতেছে না,—বিশেষতঃ সামান্য কেরাণীশ্রেণীর পুত্রগণের উপযুক্ত কোন শিক্ষাই হইতেছে না। এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় আমার পুত্র দুইটি ও একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ইস্কুলের বহি-শ্লেট-হাতে আসিয়া ইস্কুলের মাহিনা চাহিল। তিনটির মাহিনা,—পঞ্চাশ টাকা মাহিনার কেরাণী আমি,—তারপর রোগশয্যায় পড়িয়া অর্দ্ধবেতনে আছি,—২৫৲ টাকার মধ্যে ১২৲ টাকা বাহির করিয়া দিয়া মনে মনে বলিলাম—‘এবমস্তু’।

৭

একদিন মনে হইল,—কায়স্থের উপনয়নে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অনেকে চটিতেছেন কেন? ইহাতে ব্রাহ্মণসমাজের ক্ষতি কি? মন ভাবিয়া ভাবিয়া দেখিতে পাইল,—ক্ষতি বিন্দুমাত্রও নাই, প্রত্যুত লাভ অনেক। প্রথম লাভ,—দেশে যজন-যাজনে ব্রাহ্মণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় দিন দিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে; তাহার উপর অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজন করিতে চাহেন না। এরূপ স্থলে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া স্বব্যয়ে, স্বেচ্ছায়, স্বযত্নে কায়স্থেরা শূদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া যদি ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে বিনা আয়াসে সেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণবর্গ শূদ্র-যাজন, শূদ্রের দানগ্রহণ, শূদ্রান্নগ্রহণ প্রভৃতি পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। আবশ্যক হইলে ক্ষত্রিয়-পাচিত অন্নগ্রহণেও তাদৃশ ক্ষতি হইবে না। তবে, কথা হইতেছে, কায়স্থগণ প্রকৃত শূদ্র হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণের অধিকার তাহাদের কোথা? ব্রাহ্মণের বরে, সেকালে কত কি হইত? যে ক্ষত্রিয় লইয়া কথা, পরশুরাম কর্ত্তৃক সেই ক্ষত্রিয়জাতিই এক-বিংশতিবার লোপ হইলে পুনরায় ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিল কে? ব্রাহ্মণেরাই ত? কিরূপে করিয়াছিলেন? বিধবা ক্ষত্রিয়াদিগের গর্ভোৎপাদন করিয়া। কেন?—পৃথিবীর অর্থাৎ সমাজের মঙ্গলার্থ। যদি সেকালে এমন উপায়ে ব্রাহ্মণসমাজে বর্ণসঙ্করের দ্বারাই ক্ষত্রিয়ের অভাব মিটাইয়া লওয়াটা যুক্তিযুক্ত, বৈধ, ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ও সমাজগ্রাহ্য হইয়া থাকে,

তবে এখন তদপেক্ষা আরও সহজ উপায়ে—বিনা বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে, যে দেশে কেবলমাত্র শূদ্র ভিন্ন বর্ণ নাই, সে দেশে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিতে (অন্ততঃ নিজেদের অশূদ্রযাজিত্ব, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিত্ব-রক্ষার্থ) পরাঙ্মুখ হইতেছেন কেন? তখন বিধাতার ইচ্ছায় ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদনে ঋষি ঠাকুরদিগকে বাধ্য হইয়া অসবর্ণা, ইতরবর্ণা বিধবাগুলির গর্ভোৎপাদনে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন বিধাতার ইচ্ছায় সেরূপ কোন লোমহর্ষক ব্যাপার উপস্থিত হয় নাই, বরং কেবল বর মাত্র দিয়া ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবার মাহাত্ম্য-প্রকাশের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা—কলির ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সেকালের ব্রাহ্মণদিগের—ঋষি-বর্গের অবলম্বিত উপায় ব্যতীত অধিকতর এমন সুপবিত্র উপায়ে এই ক্ষত্রিয়-সৃষ্টির সুযোগ কেন যে ছাড়িতেছেন, তাহা ত বুঝি না! ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ উৎপন্ন হইবার নিয়মও যে ঋষিরা যেকালে করিয়া গিয়াছেন, সেই কালেই সেই ঋষিপুঙ্গবেরাই বিধবা ক্ষত্রিয়াণীদের গর্ভোৎপাদনে এবং তত্তৎ গর্ভজাত সন্তানদিগকে বর্ণসাঙ্কর্য্যজনিত পাতিত্য বা জাত্যন্তর নাম গ্রহণের বিধি হইতে মুক্ত করিয়া, সুক্ষত্রিয় বলিয়া, পুণ্যনাম, পুণ্যকীর্ত্তি, মৃত সুক্ষত্রিয়গণেরই বংশধর বলিয়া সমাজে চালাইয়া দিয়াছিলেন। এরূপে বিধবার গর্ভে পুত্রোৎপাদন যে অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের অপেক্ষা হীনমর্য্যাদা, তাহা সেই সেই উৎপাদক ঋষিঋষভগণও আজ বর্ত্তমান থাকিলে অস্বীকার করিতে পারিতেন না; কিন্তু তখন সমাজের কল্যাণার্থ ক্ষত্রিয়-সৃষ্টির প্রয়োজন, তাই "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য কার্য্যং সাধয়েৎ"—বিধি ধরিয়া ঋষি ঠাকুরেরা ক্ষত্রিয়া বিধবাগণের গর্ভোৎপাদনে তৎপর

হইয়াছিলেন। আরও এক কথা, তাহাও ঋষিবচনে—পুরাণেই পাওয়া যায়—চন্দ্রসেন রাজার বিধবা পত্নী গর্ভিণী ছিলেন। ভার্গব-ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সন্তানরক্ষার্থ গুরুগৃহে আশ্রয় লয়েন। পরশুরাম কিছুদিন পরে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে ক্ষত্রিয়লক্ষণাক্রান্ত শিশুকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কে? ক্ষত্রিয়শিশু কি না?" ব্রাহ্মণ আর্ত্তপরিত্রাণ ও শরণাগতরক্ষার্থ মিথ্যাকথনে দোষ নাই বুঝিয়া বলিলেন,—"অয়ং কায়স্থঃ"—পরশুরাম ব্রাহ্মণের চালাকি যে না বুঝিলেন, তাহা নহে, তবু বলিলেন, "এবং ভোঃ"—তদবধি সেই প্রকৃত ক্ষত্রিয়শিশু রাজবীর্য্যজাত ক্ষত্রিয়-সংস্কার-সংস্কৃত বালক 'চন্দ্রসেনী কায়স্থ' বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইল। কোন ঋষি ঠাকুরের এমন সৎ-সাহস বা সদ্বুদ্ধি বা সৎপ্রবৃত্তি হইল না যে, এই প্রকৃত ক্ষত্রিয় বালকের ক্ষত্রিয়ত্ব উদ্ধার করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশ রক্ষা করেন। অথচ আপনাদের কামসৃষ্ট কতকগুলা বর্ণসঙ্কর বালককে সুক্ষত্রিয় বলিয়া চালাইয়া দিলেন! কি বলিব? সমস্ত ক্ষত্রিয় তখন লুপ্ত, কিন্তু সমস্ত ব্রাহ্মণ, সমস্ত ঋষি-সমাজও তখন মাতৃবধজনিত উন্মত্ত ভার্গবের ভয়ে এমনই বীভৎসরূপে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সত্যকে, প্রকৃতকে, বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইতে সাহস পাইলেন না! পরশুরাম ভগবানের অবতার,—কাজেই তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকিবেই। মাতৃবধহেতুকে উপলক্ষ করিয়া তিনি দুর্দ্ধর্ষ, দুর্দ্দমনীয় পৃথিবীর ভারভূত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিতেই অবতার হইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার উন্মত্ততার মধ্যেও শৃঙ্খলা (method in madness) না থাকিলে চলিবে কেন?—তিনি প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিয়া দেখিলেন,

ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বীর্য্যে উৎপন্ন বর্ণসাঙ্কর্য্যজাত কতকগুলি বালককে ক্ষত্রিয় বলিয়া 'জাহির' করিলেন। পরশুরাম তাহাদের উৎপত্তি-রহস্য জানিয়া তাহাদিগকে হনন করিবার জন্য আর দ্বাবিংশতি বার কুঠার ধরেন নাই, বোধ হয়, তপোবনেও সুশীতল ইঙ্গুদীতরুচ্ছায়ায় বসিয়া একটু হাসিয়াও থাকিবেন!—কাজেই বলিতে হয়, আজ কাল ভার্গবের মত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে বলপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়সমাজ সৃষ্টি করিবার মত কোন হেতু নাই। অবর্ণ বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিয়া, তাহাকে শ্রেষ্ঠবর্ণত্ব দান করিয়া—অকাণ্ডকে প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া তুলিবার মত কোন হেতুও নাই। সমাজরক্ষার্থ অগম্যাগমন, পরস্ত্রীগমন, বিধবার গর্ভোৎপাদনরূপ সমাজ-বিপ্লবকর উপায়, বর্ণগুরু সমাজনেতা ঋষি ঠাকুরগণের স্থানীয় এখনকার ব্রাহ্মণবর্গকে অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিতে হইবে—কলি-কালের এই কলুষিত সমাজেও তত বড় দুর্দ্দশা ঘটে নাই, সত্য গোপন করিয়া শ্রেষ্ঠবর্ণের জাতিলোপ করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়কে কায়স্থ-পরিচয়ে নূতন জাতি সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণকে মিথ্যাচার অবলম্বন করিতে হইবে, এমন কোন কারণও এখন সমাজে উপস্থিত নাই, অথচ সেকালের ভুল সংশোধন করিয়া—শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ঔরসে প্রকৃত ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত ভার্গব-ভয়ে ভীত হইয়া গুরু কর্ত্তৃক কায়স্থ-পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিরা যদি ব্রাহ্মণেরই সাহায্যে নিজেদের লুপ্তবর্ণ উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণসমাজকে অশূদ্রযাজী অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী করিয়া তুলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দের কি আপত্তি হইতে পারে, তাহা ত ভাবিয়া পাই না? তারপর দুনিয়াদারীর দিক্ হইতেও এ বিষয়ের লাভালাভ দেখা গেল,—দেখিলাম, সেদিকেও লাভ কম নহে।

বাঙ্গালা দেশের লক্ষ লক্ষ কায়স্থ যদি উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করে, তাহা হইলে, বিনা বাক্য-ব্যয়ে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা গরীব চালকলা-ভোজী ব্রাহ্মণের ঘরেই ত আসিবে! অতএব এদিকে আপত্তি কিসের? বাঙ্গালী কায়স্থের আর স্বতন্ত্র চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ হয় না। সুতরাং জাতকর্ম্ম ও বিবাহ ব্যতীত কায়স্থ-বাড়ীতে ব্রাহ্মণের আর কোন সংস্কারে কিছু প্রাপ্তি ঘটে না। যদি উপনয়নটা চালাইয়া দিতে পার, হে নির্ধন ব্রাহ্মণসমাজ! পুরুষপরম্পরাক্রমে তোমাদের লুপ্তবৃত্তির পুনরুদ্ধার অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে হইবে না কি?—তারপর গায়ত্রীদীক্ষা দিয়া কুশণ্ডিকার ব্যবস্থা করিলে, বিবাহ-ব্যাপারেও আর একদিন কিছু প্রাপ্তির পথ করিতে পারিবে! তারপর উপবীতী কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, ভবিষ্যতে সেরূপ কায়স্থ যজমানের বাড়ীতে গুরু-পুরোহিতকে গিয়া হাত পুড়াইয়া হবিষ্যান্ন রাঁধিতে হইবে না। আবশ্যক হইলে বিভাণ্ডকপুত্র ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় ক্ষত্রিয় দশরথকন্যা লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণের নজীরে অর্থশালী কায়স্থ যজমানের রূপবতী কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেই বা জাতি মারে কে? আর কোন কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়ের এমন সাহস হইবে যে, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, গৌতম, শাণ্ডিল্যের বংশধর কন্যার পাণিগ্রাহী হইলে, প্রত্যাখ্যান করিবে? এখন দক্ষিণা কম দিলে কোন কোন দুর্ব্বাসার অংশভূত গুরু-পুরোহিত যজমানের পিতৃপুরুষের অপূর্ব্ব আহারের ব্যবস্থা করিয়াই যজমানটিকে হয় ত হারান, কিন্তু তখন হিন্দুস্থানীর ন্যায় সত্যসম্বন্ধে 'শ্বশুর' বলিলেও যজমানের চটিবার উপায় থাকিবে না। এত সুবিধার আশা যেখানে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কেন সেখানে বাদী হইতেছেন, বুঝিতে

পারি না! এই সময়ে উপবীতী কায়স্থ বন্ধু অমূল্যচরণ নূতন মাজা পৈতা গলায় দিয়া আমায় দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, "আমি মহর্ষি ভরদ্বাজের বংশধর, ফুলের মুখুটি, রামের সন্তান, ফুলিয়া মেলের কুলীন, আমি আপনাদের ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিব, আমায় দক্ষিণা দিবেন।" তিনি বলিলেন, "সমস্ত সত্য, কিন্তু আপনি 'বামুনপণ্ডিত' নহেন, আপনার স্বাক্ষরে আমাদের কাজ হইবে না!" আমি বলিলাম,—'শুভমস্তু'।

৮

একদিন মনে হইল,—ইংরেজ ঘাড়ের চুল খাটো করিয়া ছাঁটে, তাহার অর্থ আছে,—বাঙ্গালী যুবকেরা কেন ছাঁটে?—ইংরাজ শীতপ্রধান দেশের লোক, জল ব্যবহার করে কম,—কাজেই তাহাদের মুখ, হাত ও মাথা ধোয়া ব্যতীত সর্ব্বদা গাত্র পরিষ্কার করিবার উপায় নাই। তদ্ভিন্ন তাহারা গরম কাপড় পরে, কফ্ ও কলার বদ্‌লাইয়া বস্ত্রের পরিচ্ছন্নতা দেখায়, এজন্য তাহাদের সর্ব্বদা কাপড় বদ্‌লাইতে হয় না, একটা কামিজ একটা কোটেই বহুদিন চালাইয়া দেয়। বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতাও তাহার কতকটা কারণ। সাধারণ গৃহস্থ ও সামান্য লোকে দুই তিন স্যুট পোষাকী কাপড় রাখিতে পারে না, এজন্য দেহের, বিশেষতঃ ঘাড়ের ও গলার ময়লায় দামী গরম কাপড়ের কোটটা নষ্ট না হয়, সেদিকে সতর্ক হইবার জন্যই তাহারা কলার ও কফ্ পরে। ভদ্রতা-রক্ষার্থ কলারও পরিষ্কার রাখা চাই। ঘাড়ের ময়লা যাহা লাগে, তাহা কলারের ভিতরের পিঠে লাগে, কিন্তু ঘাড়ের চুল বড় থাকিলে, চুলের ময়লা (হেয়ার-অয়েলের দাগ) লাগিয়া (আমাদের ঘর্ম্মাক্ত জামার ন্যায়) এক দিনেই কলারের বাহিরের পিঠও নষ্ট করিয়া দেয়, এজন্য যাহাতে কলারে মাথার চুল না লাগে, ঘাড়ের চুল এমন খাটো করিয়া ছাঁটিতে বা কামাইতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের শীতপ্রধান তুষারপাতের দেশে সর্ব্বদা বৃহদাকার টুপি ব্যবহার করিতে হয়, ইহাতে শীতনিবারণ হয়, কিন্তু মাথায়

একটা উষ্ণতা বোধ হইতে থাকে। চুল বড় রাখিলে সে উষ্ণতা বাড়ে, কাজেই যতটা পারে, ঘাড়ের ও কানের পাশের চুল কেয়ারি করিয়া, খাটো করিয়া ছাঁটিয়া থাকে। মাথার মধ্যস্থলে সম্মুখের দিকে তাহারা বড় চুল রাখিতে বাধ্য হয়। কারণ, ভদ্রতার নিয়মানুসারে তাহারা ঘরে, দোকানে, গাড়ীতে ঢুকিয়াই বিশেষতঃ লোকের সম্মুখে টুপি খুলিয়া রাখিতে বাধ্য। সেইজন্য তাহারা নেড়ামাথা পছন্দ করে না।—আমি যতটুকু ভাবিয়া পাইলাম, তাহাতে ইংরেজের ঘাড়ে খাটো করিয়া চুল ছাঁটিবার আর অন্য কারণ ত কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না; কিন্তু বাঙ্গালী কিশোর ও যুবকের পক্ষে এসকল কারণ কিছুই বর্ত্তমান নাই। ইহারা কলার ব্যবহার করে না, সেজন্য বাঙ্গালীর কোটগুলার অপরাংশ অপেক্ষা থাড় আগে নষ্ট হয়। বাঙ্গালী যুবক তিন আঙ্গুলে হেয়ায়-অয়েল মাথিয়া চুল ফিরাইতে আজও শেখে নাই। তাহাকে দস্তুরমত "চিনের-বাদাম, পোস্ত ও শোরগোঁজা-মিশ্রিত খাঁটি সরিষার তৈল" মাখিয়া স্নান করিতে হয়। চুলে এই তৈল কতকটা আট্‌কায়, কিন্তু ঘাড়-ছাঁটা আধ-কামান মাথার খুলিতে সে তৈল দাঁড়ায় না,—তাহা সমস্ত গড়াইয়া কোট ও কামিজের ঘাড় নষ্ট করে। সাধারণ গৃহস্থ বাঙ্গালী ঘামের দাগ-ধরা, ম'ষে-ধরা, কামিজও পরিয়া আপিস-কুঠিতে বাহির হইতে লজ্জাবোধ করে না, সুতরাং গরম কোটের ঘাড়গুলা তেলে-জলে পাকিয়া কাঠের মত শক্ত হইলেও তাহারা কলার ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করে না। তাহার পর, তাহাদের টুপি, পাগড়ী—কোন উৎপাত নাই।—যাঁহারা আপিসে ফেল্টের গোল টুপি ব্যবহার করেন, তাঁহাদের সাধের ছাঁটা, সাম্‌নের কাকাতুয়া-

ঝুঁটির মধ্যে মাছের কাঁটার মত সীঁথা-কাটা টেরিই ঢাকা থাকে,—খাটো-ছাঁটা ঘাড় বা অর্দ্ধ-কামান কর্ণপার্শ্ব সে টুপিতে ঢাকা পড়ে না!—তবে ইহার প্রয়োজন কি? ভাবিয়া ভাবিয়া কেবল ফিরিঙ্গী অনুকরণ ভিন্ন আর কোন কারণই ত দেখিতে পাইলাম না। ইংরেজী 'ফ্যাশান' কথার মানে বুঝি, তাহাতে সাজ-পোষাকে নব-সৌন্দর্য্য-বিকাশের চেষ্টা থাকে,—কিন্তু এখানে সৌন্দর্য্য-বোধ যে কাহারও আছে, তাহা ত বুঝি না। দু'এক জন পিল ইয়ার বাবু আবার এমন সুসূক্ষ্ম করিয়া ঘাড় ও কানের পাশ ছাঁটিয়া কামাইয়া থাকেন যে, দেখিলে সেকালের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মাথার আধখানা কামান থরকাটা চুলের ভাব মনে পড়ে! কেবল চুল নহে, দাড়ি কামাইবারও কত ঢঙ্ হইয়াছে! কেহ চিবুকে (থুঁতিতে) চুল রাখিয়া অন্য সমস্ত অংশ কামান, কেহ অধরের নিম্নের কয়েকগাছি চুল রাখিয়া আর সমস্ত কামান, কেহ বা সমস্ত দাড়ি খাটো করিয়া ছাঁটিয়া চিবুকের নিম্নে ক্রমসূক্ষ্ম কতকগুলি দীর্ঘ চুল রাখেন, কেহ বা চিবুকের কেশাংশ রাখিয়া বাকী সমস্ত কামাইয়া ফেলেন!—ইহাতে যে কিরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়, তাহা ত বুঝিয়া পাইলাম না। ফিরিঙ্গীর মুখের অনুকরণ ভিন্ন প্রয়োজনও আর কিছু দেখি না!—বাঙ্গালীর এই অনুকরণ-প্রিয়তা নূতন নহে। মুসলমান-রাজত্বেও বাঙ্গালী অনুকরণ করিয়া আবা, কাবা, চাপকান, আচকান, মোড়েশা, ফতুহা, পিরিহান, রুমাল, ইজের, পাজামা সমস্ত পরিত, কিন্তু তাহার ধাতু ঠিক রাখিয়া তাহাকে নিজেদের মত করিয়া লইত। তাহারা আবা, কাবা, চাপকানের বোতামের রোক ফিরাইয়া লইয়াছিল, আস্তিনের ঝুল বাদ দিয়াছিল, মোড়েশা ডান দিকে ফিরাইয়া

বাঁধিত, জোব্বার গলার ছাঁট বদলাইয়া চোগা করিয়া লইয়াছিল, আর কেশ-প্রসাধন-বিষয়ে, বাব্‌রি রাখিত, মাথার মাঝখান কামাইত না, পুরাপুরি গালপাট্টা রাখিত, মাথা কামাইয়া কেবল জুল্‌ফি রাখিত না, সমস্ত চুল খুব খাটো করিয়া ছাঁটিত, কিন্তু শিখাহীন করিয়া মুণ্ডন করিত না। সমস্ত দাড়ি রাখিয়া আবক্ষলম্বিত হইতে দিত, কিন্তু গালের ও চিবুকের উপরিভাগ কামাইয়া মোগলাই সৌন্দর্য্য ফুটাইতে চেষ্টা করিত না, সমস্ত দাড়ি রাখিয়া চিরিয়া দুই ভাগ করিয়া দাড়ির প্রসাধন করিত, কিন্তু ছাঁটিয়া-কাটিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিত না, আর সমস্ত কামাইয়া চিবুকের নিম্নে কেবল 'নূর' ত রাখিতই না।—এইরূপে মুসলমানী বেশভূষার প্রলোভনে পড়িয়া সেকালের লোকে যদিও সমস্তই মুসলমানের নকল করিত, তথাপি প্রত্যেক বিষয়ে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য ব্যবস্থা করিয়া লইত যে, হিন্দু মুসলমান দেখিলেই চেনা যাইত। তখন আত্মসম্মান-জ্ঞানটা প্রবল ছিল; আর এখন ফিরিঙ্গীর অনুকরণে একেবারে পুরা ফিরিঙ্গী সাজিবার স্বতঃপরতঃ চেষ্টা হইতেছে। বাপের পয়সা দিয়া নিজের মাথা ও মুখখানা চাঁচিয়া-ছুলিয়া পুরাদস্তর একটা ট্যাশ ফিরিঙ্গীর মুখ বানাইতে এখনকার কৃতবিদ্য মর্য্যাদাবোধসম্পন্ন ভদ্র যুবকগণকে লালায়িত হইতে দেখিয়া আমার মনে হয়, ইহাদের উদ্দেশ্য কি মাথা ও মুখ ফিরিঙ্গীবেশে গড়িয়া লইয়া হ্যাট্ কোট্ পরিয়া বাহির হইলে লোকে তাহাদিগকে চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, ঘোষ, বসু, সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত বা দত্তের সন্তান না বলিয়া যাহাতে এঁড্রু-পেঁড্রুর (Andrew, Pedro) সন্তান বলে, তাহারই চেষ্টা করিতেছে না কি ?—এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আসিলেন—তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতে

তিনি বলিলেন, "বেশ কথা, এবার পরিষদের অধিবেশনে 'বাঙ্গালীর সাজ-পোষাকের প্রত্নতত্ত্ব' প্রবন্ধ পাঠ করিব।"—আমি বলিলাম, 'তথাস্তু'।

৯

একদিন মনে হইল,—বাঙ্গালী করিবে কি ?—ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী করিবে কি ? বাঙ্গালী জমীদারশ্রেণী বাঙ্গালীর সমাজে চিরকালই শীর্ষস্থানে ছিলেন, এখনও আছেন। দেশের সমস্ত সৎকার্য্য তখনও জমীদারশ্রেণীর দ্বারাই হইত, এখনও হইতেছে ; কিন্তু তখনকার কালে কার্য্যকরণে তাঁহাদের যে স্বাধীনতা ছিল, ইংরেজ-আমলে ইংরেজের আইনবশে ও ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে সে স্বাধীনতা নাই। এখন জমীদারেরা কেবল করসংগ্রহ ও আত্মবিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের যশ, কীর্ত্তি ও প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিমালার সঙ্গে তুলনায়, তাঁহাদের যশ, মান লাভের উপায়গুলির ধারণা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে ; কাজেই এখনকার জমীদারদিগের কীর্ত্তিতে কোন পূর্ত্তকার্য্য, দৈবকার্য্য বা পৈত্র্যকার্য্যের অনুষ্ঠান দেখা যায় না। সমাজশাসন বা পালনের কোন কার্য্যেও আর এখন তাঁহাদের হাত দিবার উপায় নাই। এখন সরকারী বা বে-সরকারী কোন অনুষ্ঠানে কিছু চাঁদা পাঠাইয়া দিলেই তাঁহাদের যশ, মান ও কীর্ত্তিরক্ষার সম্পূর্ণ উপায় হইয়া যায়। প্রজারক্ষার ব্যবস্থায়ও আর তাঁহাদের হাত দিবার প্রয়োজন নাই,—কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য গভর্মেণ্টের কৃষি-বিভাগ আছে, পূর্ত্ত-বিভাগ আছে, আপদ-বিপদ-রক্ষার্থ পুলিশ আছে, বন-বিভাগ আছে ; ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বাণিজ্য-বিভাগ আছে। যদিও সাক্ষাৎ-

সম্বন্ধে এ সকল বিভাগ কোন জমীদারের কোন অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, তথাপি পরোক্ষে ঐ সকল বিষয়ে ঐ সকল বিভাগ দ্বারা দেশের সর্ব্বত্র এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, জমীদারদিগের স্বাধীন-ভাবে কোন-কিছু করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা ও অনুৎসাহ জন্মে। কাজেই এই সকল ভাবিয়া দেখিলে, জমীদারদিগের সেকালের মত আর কোন কার্য্যই করিবার নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবার পক্ষেও বিষম বাধা ঘটিয়াছে। যজন-যাজন ক্রমশঃ দেশ হইতে লোপ হইতেছে। অবশ্য এ লোপ এখনকার শিক্ষিত-সমাজের মধ্যেই দেখা যাইতেছে। দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা এখন নগণ্য হইলেও, দেশের শক্তি সেই নগণ্য সংখ্যার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই সেই শ্রেণীর অনুকরণে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের যে সকল বৃত্তি বিধান ছিল, এখন আর তাহা নাই। পূর্ব্বদত্ত বৃত্তি এখনকার কালে উত্তরাধিকারসূত্রে বহুধা বিভক্ত হওয়ায়, সেই সকল ব্রাহ্মণবংশ আর স্ববৃত্তিতে নির্ভর করিয়া থাকিতে না পারিয়া শ্ব-বৃত্তির অনুসরণে বাধ্য হইয়াছেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনে এখন অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেই নিযুক্ত আছেন। বেতন লইয়া বিদ্যা-বিক্রয় এই সমাজের ধর্ম্মবিগর্হিত, কাজেই যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষলব্ধ বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং দেশের ধনিসমাজের প্রদত্ত সাময়িক সাহায্য-প্রাপ্তির আশায় বিদ্যাদান করিতে পারেন, তাঁহারাই এ কার্য্যে আজকাল অগ্রসর হন, নতুবা কাহারও সাহস হয় না। ইহা হইলেও অধ্যাপক-বৃত্তি এখনকার বংশানুক্রমে চলে না। বহু প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের পুত্রকেই

ভবিষ্যতের জন্য উক্ত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া শ্ব-বৃত্তির জন্য শিক্ষিত হইতে দেখা যায়। সাধারণ গৃহস্থের এখন আর শ্ব-বৃত্তি ভিন্ন গতি নাই; কিন্তু সেকালের ন্যায় সেই শ্ব-বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা কিন্তু এখন এদেশে কিছুই নাই। এ দেশের আধুনিক পাঠশালা হইতে কলেজ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দেশের আপামর সমস্ত লোককে মহাপণ্ডিত করিবার আয়োজন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী কিছুই শিক্ষা হয় না; কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে মহা মহা উপাধি-ধারী সহস্র সহস্র যুবক কৃতবিদ্য হইয়াও এক পয়সা উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন না। সকলের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, কাজেই সকলে কলেজের শিক্ষা শেষ করা দূরে থাক্, ইস্কুলের শিক্ষাও শেষ করিতে সুবিধা বা সুযোগ পান না,—সে অপরাধ তাঁহাদের নহে, কিন্তু তাঁহারা যে গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা পায় না, দেশ-ব্যবস্থার, সমাজ-ব্যবস্থার এ ক্ষুণ্ণতা কি দূর করিবার কোন উপায় নাই? সেকালে দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত অপর সকল জাতির জাতিগত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারা তদবলম্বনে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত, কিন্তু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া, কল-কব্জার উন্নতি করিয়া, দেশের সমস্ত শিল্প-জীবীর বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়া, দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোককে নিরন্ন-করিবার উপায় করাটা যে একটা মস্ত প্রতিভার লক্ষণ নহে, তাহা আমাদের দেশে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানাদির উন্নতিতে দেশের লোকে যদি ধনধান্যবান্ না হয়, সে উন্নতি লইয়া এবং সে উন্নতির চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হইয়া আমাদের লাভ কি? আমরা নির্ধন জাতি—আমাদের পরকৃত উন্নতির প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিলে

কি হইবে? বুঝিতে পারি, বিদেশী বণিক্, বিদেশী রাজশক্তি আমাদের মাঝে পড়িয়া এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে, কিন্তু যাহা দিয়াছে, তাহাই এ যুগের পরমার্থ—স্ব-বৃত্তিই—উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিতেছি না কেন? আমরা উচ্চশিক্ষার লোভে পড়িয়া আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন-উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি না কেন? এ দিকে ত নিষেধ নাই। কলেজের অনুকরণে শিল্পশিক্ষার টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল বা কলেজ করিলে চলিবে না। তাহাতে ঐরূপ ফলই ফলিবে, কেরাণীগিরি, সওদাগরী, সরকারী আপিস-সমূহের ও আদালতের কেরাণীগিরি শিখাইবার ইস্কুল আমাদের দেশে করিলে কি চলে না? টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলে ছুরী গড়িবার, স্ক্রু গড়িবার, রেঁদা ঘুরাইয়া পালিস করিবার ছাত্র—আজকাল সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক্—কর্ম্মকার জাতিরও প্রত্যেক দরজায় ঘুরিয়াও একজনও পাইবে না; কিন্তু কেরাণীগিরি শিক্ষা দিবার কারখানা কর, দেখিবে—তোমার বড় বড় জেলা স্কুল ও কলেজ ভাঙ্গিয়া ছাত্রদল ছুটিয়া আসিবে। জমীদারী কাজ, দালালী কাজ, পোরমিটের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা কর, দেখিবে তাহাতে ছাত্রাভাব হইবে না, ছাপাখানার কাজ, গুদামের কাজ, রেলওয়ের কাজ, ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা কর, দেখিবে ময়রার দোকানের বোলতার মত কত শত ঘুরিবে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে উচ্চ-ব্যবস্থা শিখিতে হইলে প্রত্যেক দিকে আবার কয়েক বৎসর সেই সকল ব্যবসায়-ঘটিত শাস্ত্র পড়িতে হয়, চিকিৎসা, ওকালতী, এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি কার্য্যকরী ব্যবসায়েও আবার পরীক্ষা পাশের সঙ্গে-সঙ্গেই উপার্জ্জন ঘটে না, কতদিন ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভেরেণ্ডা

ভাজিয়া পসার জমাইতে হয়। কাজেই খুব শীঘ্র হইলেও ত্রিশ বৎসরের কম কোন যুবক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এখনকার দিনে উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে না। এই ত অবস্থা! এখন উপায় কি? বাঙ্গালীর জাতিগত বৃত্তি—উপার্জ্জন-ব্যবস্থা কতক খাইয়াছে—ইংরেজ-অনুকরণে স্বাবলম্বনের স্বর্ণমোহে; আর কতক খাইয়াছে—বিদেশী বণিকের ব্যবসা বাণিজ্যে; বিজ্ঞানের উন্নতিতে অথচ দেশের ব্যবস্থা সমাজের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের বৃত্তিবিধানকর শিক্ষার ব্যবস্থা যে কেন হয় নাই বা হইতেছে না, তাহার জন্য কাহাকে দায়ী করিব?—অদৃষ্ট? —তা ভিন্ন ভাগ্যবাদী এ জাতির সান্ত্বনাস্থল আর কি আছে, অথবা সত্যই বা কি আছে? হে দেশের প্রিয়চিকীর্ষু হিতকামী নেতৃবর্গ! তোমরা কলেজ-ইস্কুলের শিক্ষার ভাব ফিরাও, দেশের সকলশ্রেণীর লোকের দিকে চাহিয়া দেখ, সকলেই উন্মত্তের ন্যায় তোমাদের প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষার দিকে ছুটিয়া দেশের দারিদ্র্য, দেশের অস্বাস্থ্য বাড়াইয়া তুলিতেছে। শিক্ষার নামে মাকাল ফল দিবার চেষ্টা করিও না! উচ্চশিক্ষা আচণ্ডালে বিলাইতে পার, কিন্তু সকলেই সক্ষম কি না, সেটা ত বুঝিয়া দেখ না। শিক্ষা দাও, কিন্তু এমন করিয়া শিক্ষা দাও, যাহাতে দেশের বৃত্তিবিধান হয়। আমাদের দেশের প্রবচন স্মরণ কর—"সবাই যদি শিরোমণি, কে বা হবে রাঁধুনী"—দেশ কেবল "শিরোমণি" লইয়া চলে না, "রাঁধুনী"ও চাই। ব্যাস-বাল্মিকীর সময়েও ব্রাহ্মণে "রাঁধুনী" হইত, ব্রাহ্মণমাত্রেই ঋষি মুনি হইত না,—ভীম অজ্ঞাত-বাসকালে "বল্লব সূপকার" হইয়া তাহা জানাইয়া দিয়াছিলেন।

এইখানে একটা সত্য ঘটনা—যাহা আজই আমার চোখের উপর

ঘটিয়াছে, তাহা বলিব। বিলাসী জেলেনী সকালে মাছ দিতে আসিয়া মহা তাড়া দিতে দিতে বলিল,—"ও গো মাছ নিয়ে যাও"—মা রন্ধনশালায় ব্যঞ্জনে সম্বরা দিতে দিতে বলিলেন,"দাঁড়া না বাছা, তোর ত আর আপিস-কুঠির ভাত দিতে যেতে হবে না।"—বিলাসী বলিল,—"হাঁগো মা, হাঁ তাই হবে।"—মা কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"—বিলাসী বলিল,"সে দুঃখের কথা আর কেন বল মা,—আমার চার বেটা,—ইস্কুলে পড়িয়েছি। কেউ ঘড়ির কাজ, কেউ ছাপাখানার কাজ, কেউ মোক্তারী, কেউ বাঙ্গালা ডাক্তারী শিখিয়াছে; কিন্তু কেউ আজও একটি পয়সা ঘরে-সংসারে দিতে পারে না! সেই বুড়ো কর্ত্তা ভোরে উঠে পুকুরে পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরে আনে, বাজারে বেচে, আর আমি গেরস্তবাড়ী জোগান দি, তাতেই কোনরকমে সংসার চ'লে যাচ্ছে। ঘরে খেতেও অনেকগুলি—চার বেটা, চার বউ, কর্ত্তা, আমি, বউদের পাঁচটা কচিকাচা হয়েছে!"—মা বলিলেন, "তা ছেলেরা জাত-ব্যবসা ছাড়্‌লে কেন?"—বিলাসী বলিল, "মা, সে দুঃখের কথা বল কেন? আমাদের পাড়ার বামুন-বাড়ীর বড়বাবু এক বড় ইস্কুলের মাষ্টার, তিনি বল্‌লেন,—'জেলে বউ, তোর ছেলেদের লেখাপড়া শেখা; তোদের আর দুঃখ থাক্‌বে না।' তাই মা, শেখালুম—ছেলেরা ভাল কত সব পাশ করেছে—তা মা, আমার বরাত। আজ যদি জাত-ব্যবসা কর্‌ত—ত চার ছেলে আর কর্ত্তা পাঁচ পুকুরে জাল ফেল্‌লে আমার ভাত আজ খায় কে মা? একই কর্ত্তার মেহনতে আজও এই এত বড় সংসারটা উপোষ যাচ্চে না—পাঁচ জনে রোজগার কল্লে যে ভেসে যেত।" বিলাসী জেলেনীর কথাগুলি আমাদের ভাবিবার কথা নয় কি? উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মোক্তারী পাশ

জেলের জাত-ব্যবসায় ত্যাগ করা ভিন্ন গতি নাই, অথচ তাহার দু'দিক্ নষ্ট—ইহার মীমাংসা কি? কাজেই হে উচ্চশিক্ষাদানেচ্ছু উদারহৃদয় নেতৃবর্গ! রক্ষা কর, দেশের অভাব কোথায়, কোন্ দিকে?—চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া তাহার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা কর। কলেজ তুলিয়া দিতে বলি না। যাহারা "শিরোমণি" হইবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবে, পরিবারবর্গ যাহাদের অপেক্ষায় অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর কাল বসিয়া থাকিতে পারিবে, তাহাদের "শিরোমণি" করিবার পথ উন্মুক্ত রাখ। "আর একটা গড়" অর্থে—"আছে, সেটা আগে ভাঙ্গিয়া ফেল" নহে।—এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে জনৈক সম্পাদক-বন্ধু আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন,—"ঠিক বুঝিয়াছ, রোস"—এই হপ্তা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের ঘাড়ে পড়িয়া আন্দোলনটা জমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।"—আমি উপায় শুনিয়া হতাশ হইয়া মনে মনে বলিলাম,—'তথাস্তু!'

১০

একদিন মনে হইল,—আমাদের দেশে সংবাদপত্রের এ দুর্দ্দশা কেন ? লোকমতপ্রকাশে, লোকমতগঠনে এবং দেশের সকল প্রকার সুখ-দুঃখের সংবাদ-প্রচারে যাহার জীবন উৎসৃষ্ট, তাহার উপযুক্ত আদর হয় না। লোকমত অবলম্বনে যাহাকে রাজ-দরবারে মন্ত্রীর ন্যায় পরামর্শ দিতে হইবে, রাজদ্বারে সে অহৈতুক বন্ধুর আদর বা প্রতিপত্তি হয় না কেন ? ভাবিয়া ভাবিয়া কত কথাই মনে উঠিল ! —প্রথমতঃ মনে হইল,—সংবাদপত্র নিজের 'সংবাদপত্র' নামটাই বজায় রাখিবার জন্য বিশিষ্ট যত্ন ও উপায় কিছুই করেন না ; সকল সংবাদ-পত্রেই 'সংবাদ', 'মফস্বল', 'সংবাদদাতার পত্র', 'প্রাদেশিক সংবাদ' ইত্যাদি-শীর্ষক আসল সংবাদ-স্তম্ভগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। পূজার পূর্ব্বে সহরের একখানি সুবৃহৎ সংবাদপত্রে দেখিলাম, এত বড় বিশাল বঙ্গদেশের তিনখানি মাত্র গ্রামের তিনটি অতি সামান্য সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ; দশ লক্ষ লোকের অধ্যুষিত কলিকাতা মহানগরীর সংবাদ ১২টি লাইনে শেষ হইয়াছে ! সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্তম্ভটি অধিকাংশই মা দুর্গার উপর নানাপ্রকারের মন্তব্য প্রকাশ করিতেই ভরিয়া গিয়াছে ! প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই "আয় মা, মুখ তুলিয়া চাহ মা" বলিয়া কাঁদিয়া ভরান হইয়াছে ! আর বাকীটা বলকান যুদ্ধের খুঁটিনাটি খবরেই ভরা !—এরূপ সংবাদপত্রে দেশের লাভালাভ কি ?

মফস্বল-সংবাদ সংগ্রহ করা কি এ সকল সংবাদপত্রের পক্ষে এতই দুর্ঘট! শুনিতে পাই, অনেক সংবাদপত্রের বিশ ত্রিশ হাজার গ্রাহক! —যাঁহাদের এত বন্ধু, তাঁহারা মফস্বলের-সংবাদ সংগ্রহের উপায় করিতে পারেন না কেন? প্রত্যেক মফস্বলের গ্রাহক যদি স্ব স্ব গ্রামের সংবাদ দেন, কোন সংবাদপত্রে তাহার সকলগুলির স্থান সংকুলান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? তবে সকলেই সংবাদ-দাতার উপযোগী না হইতে পারেন, কিন্তু কৃতবিদ্য, নায়েব-গোমস্তা, উকীল-মোক্তার, ডাক্তার-কবিরাজ, ইস্কুলের শিক্ষক, পাঠশালার গুরুমহাশয়, ইস্কুল-কলেজের ছাত্র প্রভৃতিকে সংবাদ-দাতা করিয়া লওয়া যাইতে পারে ত! যে সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা রাজা রাজমন্ত্রীর গুহ্য পরামর্শ না জানিয়াই, তাঁহাদের আইনের বা কার্য্যের ভুল ধরিয়া নিজের অভ্রান্ত বিশিষ্ট মতের প্রচারে সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব ও উদ্যতায়ুধ, তাঁহাদের পক্ষে এ কাজটা কি বেশী কষ্টকর, না ব্যয়সাধ্য? ১০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক ৷৶০ আনায় উপহার দিয়া গ্রাহক জুটান যত না সহজ, একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামান্য একটা সংবাদ প্রকাশ করিয়া সে গ্রামের সহানুভূতি লাভ করিয়া, সে গ্রামে গ্রাহক-সংখ্যা বাড়ান তদপেক্ষা সহজ হয় না কি? মফস্বলের স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিও এ বিষয়ে আরও উদাসীন। তাঁহারা কলিকাতার পত্র হইতে পুরাতন সংবাদগুলির চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়াই স্বকর্ত্তব্য সমাধা করেন। তাঁহাদের স্থানীয় সংবাদ-স্তম্ভগুলি কলিকাতার সংবাদপত্রের 'মফস্বল-সংবাদ'-স্তম্ভের অপেক্ষাও অল্পায়তন! মফস্বল-সংবাদপত্রগুলি প্রায়ই জেলার সদর সহর বা সবডিভিজানের সদর সহর হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে;

কিন্তু কৈ সেগুলিতে সদর সহরের অবশ্যজ্ঞাতব্য সংবাদ দেখা যায় না,— এমন কি মফস্বল কোর্টের মামলা-মোকদ্দমার সংবাদও প্রতি সপ্তাহে পাওয়া যায় না,—অথচ অনেক মোকদ্দমার আপীল হইলে কলিকাতার পত্রাদিতে অন্ততঃ হাইকোর্ট-স্তম্ভে তাহাদের উল্লেখ দেখা যায়! এক একটা জেলায় ৩।৪টা সবডিভিজান, কতকগুলি মহকুমা সহর আছে,—এই সব সহরের দৈনিক সংবাদ যদি জেলার পত্রগুলিতে সংগৃহীত হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হয় না কি? মফস্বল-সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা কলিকাতার সংবাদের জন্য, বিদেশের সংবাদের জন্য না হয়, তাদের মুখ চাহিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু মফস্বলের সংবাদের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিয়া কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিকে আপনাদের প্রতি উদ্‌গ্রীব করিয়া রাখিতে পারেন না যে কেন, তাহা বুঝিতে পারি না! সংবাদ-দাতা পাওয়া যায় না, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। গ্রাম্য চৌকিদার আর সহুরে পাহারাওয়ালার সংবাদের উপর যখন এত বড় ইংরাজ রাজত্বটা চলিতেছে, তখন একখানা ৮।১০ পৃষ্ঠা রয়াল চারি পেজী সংবাদপত্রের জন্য স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ কি এতই দুরূহ ব্যাপার! ব্যয় খান-কয়েক পত্র লেখালেখির মাশুলবৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুতে যে বাড়ে, তাহা ত মনে হয় না। বেতনভোগী বা বৃত্তিভোগী সংবাদ-দাতার প্রয়োজনীয়তা এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। বিনাব্যয়ে একখানা সংবাদপত্র পাইলেই অনেকে যথেষ্ট সম্মান মনে করিয়া এই সংবাদ-দাতার কার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন। সম্পাদকীয় স্তম্ভে রাজনীতির ও রাজপুরুষগণের কার্য্য-সমালোচনাই বেশী থাকে। ইহা অকর্ত্তব্য মনে করি না, কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত, সংবাদপত্রের সকল

কথাই রাজদ্বারে বা রাজপুরুষগণের কর্ণে পৌঁছায় না। সংবাদপত্রের মন্তব্য অনুবাদের জন্য সরকারী ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনুবাদকেরা সংবাদপত্রের এই সমস্ত সমালোচনা বা সমস্ত অভাব-অভিযোগের সংবাদ অনুবাদ করেন না, করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে; কিন্তু সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা সেগুলা রাজদ্বারে জানান, যদি আবশ্যক বলিয়াই বুঝেন তবে। তাঁহারা আপনা হইতে তাহা জানাইবার কোন ব্যবস্থা রাখেন না কেন? সামান্য একটা উদাহরণ দিব—কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল, অমুক গ্রামে ডাকঘর, রাস্তাঘাট ও পুলিশের ব্যবস্থা ভাল নহে। এরূপ সংবাদ ছাপিয়া মাত্র দিলে, কোন দিন যে কোন ফল হইবে না, ইহা তৎপত্রের সম্পাদক মহাশয় নিশ্চিতরূপেই জানেন, অথচ ইহার ফল পাইতে হইলে যাহা করা উচিত, অর্থাৎ ডাক-বিভাগ, পূর্ত্ত-বিভাগ (বা জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি) এবং পুলিস-বিভাগের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া এ সম্বন্ধে প্রতিকারের প্রস্তাব করা তাঁহার পক্ষে মোটেই দুরূহ ব্যাপার নহে। ইহা করিলেই যে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার হইয়া যাইবে, তাহা কেহ আশা করে না, কিন্তু যথাস্থানে প্রতিকারের সম্ভাবনা যেখানে হইতে পারে, সেইখানে সংবাদটা পৌঁছিবে, এই আশাতেই সেই গ্রামের আর্ত্ত লোকগুলা সংবাদপত্রের শরণাগত হয়, সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা যদি সেই কর্ত্তব্যটা বিধিমত উপায়ে পালন করিয়া নিশ্চিন্ত হন, তাহা হইলেই তাঁহাদের প্রতি দেশের শ্রদ্ধাভক্তি সহস্র-গুণে বাড়ে না কি? তারপর এই শারদীয়া পূজার সাময়িক উচ্ছ্বাসের কথা,—এগুলিতে সম্পাদকগণের প্রাণের ভাব, শব্দচয়ন-শক্তি, হৃদয়মন্থনকারী ভাষা-রচনার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়—তাহাতে

দেশের লোকের লাভালাভ কি? মা দুর্গার প্রতি স্বভাবতঃ দেশের লোকের যে ভক্তি আছে, তাহা আর সংবাদপত্রের সাহায্যে জানাইবার প্রয়োজন হয় না। দেশের দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, অভাব, শস্যহানি, আপদ-বিপদ যদি কাতরপ্রাণে মা জগদম্বাকে জানাইতেই সম্পাদক মহাশয়ের এত ব্যাকুলতা জন্মে, তবে তিনি পূজার দালানে, তীর্থপীঠে, দেশের সহস্র দেবীমন্দিরে গিয়া জানাইতে পারেন,—সংবাদপত্রের সাহায্যে দেবতার নিকটে প্রার্থনা জানাইলে বিশেষ কোন দ্রুত সাফল্য ঘটে বলিয়া কোন শাস্ত্রে ত লেখে না। ইহাতে বরং সংবাদপত্রের স্থান ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসে ভরাইয়া দিয়া, তাহার অপব্যবহার করা হয়। অতঃপর বলকান-যুদ্ধের আলোচনায় রাজনীতির যে গভীর এবং উচ্চতম অংশ বুঝা যায়—বাঙ্গালা সংবাদপত্রপাঠী সাধারণ গৃহস্থ-বাঙ্গালী আমাদের তাহার সহিত কি সম্পর্ক আছে?—সম্পাদক মহাশয়েরা এদিকে উপদেশ দিবার সময় অনুযোগ করিয়া বলেন,—আমাদের স্বগ্রামের খবর আমরা বালকদিগকে শিখান আবশ্যক মনে করি না, দেশের গ্রামান্তরের পথ-ঘাট নদ-নদী খালের ব্যবস্থা জানাই না, অথচ কাম্‌স্কট্‌কা, পোপো, ক্যাটাপেটল সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ মুখস্থ করাইয়া থাকি! অথচ সংবাদপত্রে কোন্ খাল মজিয়া গিয়া দেশের কোন্ গ্রামের পথ ও বাণিজ্যকষ্ট উপস্থিত হইল, কোন্ নদী শুকাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা হওয়ায়, কোন্ গ্রামের জল-নিকাশ বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের প্রতিকার কি, এই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মহদুপকারক দেশনীতির আলোচনা না করিয়া, বলকান-যুদ্ধ ও চীনের প্রজাতন্ত্র-সৃষ্টির আলোচনা করিয়া সাধারণের অপ্রয়োজনীয় অথচ

দুর্ব্বোধ্য ও দুষ্পাচ্য বিষয়ের আলোচনা অতি অকিঞ্চিৎকর সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া অতি কাঁচা রকমেই করিতে থাকেন। কাঁচা আলোচনা বলিতেছি—কারণ, এ সকল বিদেশী উচ্চ রাজনীতির গুহ্য সংবাদ কোন দিন প্রজামণ্ডলীর বিশেষতঃ বিদেশী রাজশক্তির প্রজা-মণ্ডলীর মধ্যে কোন রাজার সচিব-সমিতি প্রকাশ হইতে দেন না; কাজেই টেলিগ্রামের দুই চারিটা ভাসা-ভাসা বাহিরের সংবাদ ধরিয়া এ সকল বিষয়ের আলোচনার প্রয়াস কাঁচা হয় না ত কি? আমাদের সংবাদপত্রে লোকমত গড়িবার একটা ঐকান্তিক চেষ্টা দেখা যায় না। স্বদেশী আন্দোলনে সেটা দেখা গিয়াছিল,—দেশের যতটুকু উপযোগিতা ছিল, ততটুকু পরিমাণে তাহা সফলও হইয়াছিল; কিন্তু আর কোন বিষয়ে ভাল বুঝিলেও সংবাদপত্রসমূহকে কোন বিষয়ে একমত হইতে দেখা যায় না। 'বঙ্গবাসী' কোন একটা সদ্বিষয়ের প্রস্তাব করিলে 'বসুমতী' 'হিতবাদী' তাহার উপকারিতা বুঝিলেও তাহার প্রতিধ্বনি করেন না। আত্মসম্মানের নামে এখানে আত্মম্ভরিতাই জয়ী হইয়া একত্র কাজ করিতে দেয় না। উদাহরণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারের কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকলেই এ বিষয়ের ক্ষুণ্ণতা, অসাফল্য ও অকৃতকারিতা উপলব্ধি করেন; কিন্তু কৈ সকলে ত এ বিষয়ে একযোগে একভাবে প্রতিকারের প্রার্থনা করিতেছেন না। কেহ ব্যক্তিগত আক্রমণে উল্লাসিত, কেহ বিধি-নিষেধের দোষোদ্‌ঘাটনে সহস্রমুখ; কিন্তু সকলে একবাক্যে কার্য্য ও কার্য্যফলের তুলনা করিয়া, ঐ সকল ক্ষুণ্ণতাপ্রকাশে একযোগে যত্নবান্ হন না! সামাজিক বিষয়েও ঐরূপ। সম্প্রতি পতিত-জাতির উদ্ধার-আন্দোলন

চলিতেছে। শাস্ত্রবাদী ও সংস্কারবাদীরা দুই দল হইয়া কেবল তর্কই চালাইতেছেন; কিন্তু প্রশ্নটার উভয় দিক্ দেখিয়া, দেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে শাস্ত্র-মর্য্যাদা রাখিয়া, মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না কেন? প্রস্কন্ন ঋষি চণ্ডাল হইয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কোন রামচন্দ্র তাঁহার তপস্যায় চটিয়া গিয়া মাথা কাটেন নাই, আবার দাশরথী রামচন্দ্র শূদ্রতপস্বীর মস্তকচ্ছেদ করিয়াছিলেন!—সংস্কারবাদীরা ধোপার ছেলেকে, চণ্ডালের ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া উন্নত করিতে চাহিতেছেন; কিন্তু তাহারা লেখাপড়ায় অর্দ্ধশিক্ষিত হইয়া চাকুরীর উমেদারী করিতে গিয়া জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশের দারিদ্র্য যে আরও বাড়াইয়া তুলিবে না, তাহার উপায় কিছু ভাবিয়াছেন কি? দেশের তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতারের জাতীয়-বৃত্তি লোপ হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্থলে দেশ-ব্যবস্থায় এই জনসঙ্ঘের বৃত্তি-বিধানের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা গিয়াছে কি? চাকুরী, ডাক্তারী ও ওকালতী ভিন্ন উচ্চশিক্ষিত কামার, কুমার, তাঁতিদের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি? সংস্কারবাদীরা এটা ভাবিয়া দেখিয়া আবার কতকগুলি জাতিকে উচ্চশিক্ষার প্রলোভন দিয়া তাহাদের বৃত্তি নষ্ট করিবার সুপন্থা করিতে অগ্রসর হইলে ভাল হয়। শাস্ত্রবাদীরাও একটা ভাবিবেন,—যদি ব্রাহ্মণ-সন্তানে ত্রিসন্ধ্যা-বর্জ্জিত হইয়া, অখাদ্য খাইয়া সমাজে অবাধে চলিতে পারেন; মেথর, মুসলমান, মগ, মাদ্রাজী পারিয়া-পাচিত মোরগাদি ভোজন করিয়া পিতৃমাতৃ-কার্য্যে দেশের সমস্ত সমাজের শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপকমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া দানগ্রহণে বাধ্য করিতে পারেন এবং সেই অধ্যাপকমণ্ডলী ঐ সকল

পতিতের দান-গ্রহণানন্তর দ্বাদশবার গায়ত্রীজপরূপ সামান্য প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াও, সমাজের বরেণ্য থাকিতে পারেন; এবং হাড়ের গুঁড়া দ্বারা শুদ্ধীকৃত লবণ ও চিনি দ্বারা পাক করা সন্দেশাদি গ্রহণে, নানা জীবজন্তুর চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃতপক্ব দ্রব্যাদি গ্রহণে যাঁহাদের পাতিত্য হয় না, সেই সকল সমাজপূজ্য শিরোমণি অধ্যাপকেরাই আবার কোন কোন পতিত জাতিকে জলাচরণীয় করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, ইহা বিসদৃশ নহে কি?—সংবাদপত্র-সম্পাদকের এখানে কর্ত্তব্য, মধ্যবর্ত্তিতা অবলম্বন, অর্থাৎ উভয় পক্ষের মতানৈক্যের মীমাংসার চেষ্টা করা; নতুবা তাঁহারা দেশব্যাপী লোকমতের গঠনে নিয়ন্তৃত্ব করিবেন কিরূপে, তাহা ত বুঝিয়া পাই না। এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় একখানি 'নায়ক' হাতে পড়িল। দেখিলাম, পাঁচু দাদা কখন ডাকিয়া-হাঁকিয়া, কখন বা টিপ্পনী কাটিয়া বলিতেছেন,—"তা না হ'লে কাগজ বিকায় না।" আমি পড়িয়া মনে মনে ভাবিলাম, "মেকি শিক্ষা, মেকি সভ্যতা, মেকি ভদ্রতার মধ্যে দেশসেবার নামেও দাদা, তোমরা মেকি চালাইতে যখন এতটা প্রস্তুত, তখন আর কি উপায় আছে? তোমাদের সকল রকম আচারই যদি মেকি-মন্ত্রে মার্জ্জিত কর, তবে আর গত্যন্তর কি?"—ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলাম,—'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।'

১১

একদিন মনে হইল,—কন্যাদায়ে বাঙ্গালার এত বিড়ম্বনা কেন? —"বাঙ্গালীর কন্যাদায়" বলিয়াই কথাটা মনে উঠিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, বাঙ্গালীর সমস্ত জাতির নিগূঢ় খবর আমার মানস-ভাণ্ডারে সঞ্চিত নাই, আমার নিজের ঘনিষ্ঠ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-সমাজের কথাই আমি বেশী জানি এবং তাঁহাদের কথা ভাবিয়াই যেন কতকটা কূল-কিনারা পাই। মন তাই ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে ভাবিতে দেখা গেল,—আমাদের মত উচ্চ-সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে আমরা জানিয়া রাখিয়াছি,—

কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

এই জন্যই সকল পিতাই কন্যার পাত্রান্বেষণে রূপ, বিদ্যা, অর্থ, কুল ও দাতা-ভোক্তা পাত্রেরই চেষ্টা করেন। সর্ব্বত্র সকলের সমাবেশ পাওয়া যায় না, কাজেই অল্লাধিক কাম্যগুণবিশিষ্ট পাত্রের নির্ব্বাচনই কার্য্যক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে। এখন যে দ্রব্যের প্রার্থী অধিক হয়, বাজারে তাহার দরও অধিক হয়, ইহা দুনিয়ার চিরসত্য নিয়ম। দুনিয়াদারীতে যখন এ নিয়মের ব্যত্যয় কুত্রাপি দেখা যায় না, তখন বরের বাজার চড়িবে না কেন? যে দর দিতে পারিবে, সে ভাল জিনিস পাইবে। গ্রহীতার রুচি ও প্রয়োজন অনুসারেও অধিকাংশ স্থলে বিষয়ের ভাল

মন্দ নির্ব্বাচিত হয়। আমরা আজ-কাল প্রাণপণ-শক্তিতে পূর্ব্বোক্ত অতগুলা কাম্যগুণের সকল ভাসাইয়া দিয়া, অর্থকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় করিয়া তুলিয়াছি। এখনকার শিক্ষা-দীক্ষা আমাদিগকে সকল ভুলাইয়া একমাত্র অর্থদৈবত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। মেয়েটা যেখানে খাইতে-পরিতে পাইবে, হাত পুড়াইয়া রাঁধিবে না, বাসন মাজিবে না, স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম করিবে না, এমন স্থলেই কন্যাদান করিতে আজ-কাল আমরা সকলেই একান্ত কামনা করি। আজ-কাল আমরা যে পাত্রের বিদ্যার পরিমাণ জানিতে চাই, তাহার মুখ্যার্থ তদ্বলে পাত্র ভবিষ্যতে কি পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, তাহারই কুৎ করিয়া লইয়া পাত্রের দর ঠিক করি, এই ভাবের অনুসারে বড়মানুষের ঘরের রূপ-গুণ-বিদ্যাহীন পাত্রও জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত গৃহীত হয়! তাহার পরেই এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার ওজনে আগ্রহ ও দরের ব্যবস্থা হয়। যাঁহারা বরের বাজারের চড়া দর দিয়া উচ্চ-শিক্ষার ছাপ-মারা পাত্র বা ধনীর সন্তানকে জামাতৃত্বে বরণ করিতে পারেন না, তাঁহারা চাকুরী-জীবী অথবা অন্যপ্রকারে "রোজগারে ছেলের" বাজারে ঘুরিতে বাধ্য হন। সেখানেও দর বড় কম নহে। এখন জমীদার ও অর্থশালীর সন্তানেরাই কুলচূড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মার্কামারা ছেলেরাই কুলীন এবং 'রোজগেরে ছেলেরা' ভঙ্গকুলীন, আর ব্যবসাদারের কাজের লায়েক ছেলেরা শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হইতেছে! যখন আদিশূর রাঢ়ীয় বারেন্দ্রের শ্রৌতবিদ্যাসম্পন্ন আদিপুরুষগণকে এদেশে আনয়ন করিয়া সমাজের মধ্যে সম্মানের সর্ব্বোচ্চ সোপানে বসাইয়া নিজে মস্তক নত করিয়া গ্রামাদি দানে তাঁহাদের পূজা করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে দেশের

ব্রাহ্মণাদি-সমাজে কি ভাবে কি কাম্যগুণবিশিষ্টতায় পাত্রনির্ব্বাচন করা হইত, তাহা আর এখন অনুধাবন করিবার উপায় নাই; কিন্তু ঐ ঘটনার পর হইতে ঐ পঞ্চ শ্রৌতজ্ঞান-সম্পন্ন রাজদ্বারে প্রতিপত্তিশালী, রাজ-পূজিত এবং তদনুসারে দক্ষিণাদিতে প্রভূত উপার্জ্জনশালী ও বিত্তশালী কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থবংশধরগণকে কন্যাদান করিতে দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ঝুঁকিয়া পড়িল। সেই ঝোঁক—সেই আগ্রহের ফলে দেশের পূর্ব্ব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজ—বিপুল সপ্তশতী ব্রাহ্মণবংশ এবং ক্ষত্রিয়োপেত কায়স্থ-সমাজ কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজে মিশিয়া গিয়া 'সাতশতী শ্রোত্রিয়' ও 'বাহাত্তুরে কায়স্থ' নামে পরিগণিত হইল। তাহার পর, যখন বল্লালের কৌলীন্য-প্রথা ব্যবস্থিত হইল,—তখনও মনে হয়, এই বিপুল-সমাজে আবার পাত্রবিভ্রাট্ ঘটিয়াছিল। সকলেই কান্যকুব্জীয় পাত্রে কন্যাদান করিতে থাকায়, কান্যকুব্জীয় পাত্রের দর বাড়িয়া গেল। তাহার উপর কান্যকুব্জীয়গণের রাজদ্বারে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকায়, তাঁহারাও ক্রমশঃ বাছিয়া বাছিয়া ধনীর কন্যাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে গরীবের পাত্রাভাব ও প্রাচীন বংশের পাত্রীর অভাব ঘটিতে লাগিল। তারপর ধনীর সংশ্রবে ও রাজদ্বারে অযাচিতভাবে বহুসম্মান এবং বৃত্তি বন্দোবস্ত থাকায় এবং মাতামহ ও শ্বশুর-বিত্তের প্রভাবে কান্যকুব্জীয়েরা ক্রমশঃ আলস্য-বিলাসের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শ্রৌতবিদ্যাচ্যুত হইতে লাগিলেন। কালে তাঁহারা এতটা বিদ্যাহীন হইয়া ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িলেন যে, রাজা বল্লাল সেনের সময়ে দেশের কান্যকুব্জীয় সমাজের একটা শাসন আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই শাসনই কৌলীন্যপ্রথা। তবে এই শাসনের মূল-নীতিতে রাজা

বল্লাল সেনের নিজের স্বার্থ নিহিত থাকায়, প্রথমটা বেশ নির্দ্দোষ হইতে পারে নাই। রাজা বল্লাল সেন নিজ গুরু সপ্তশতীবংশীয় অনিরুদ্ধ ভট্টের তান্ত্রিকাচার লক্ষ্য করিয়া কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে যাঁহারা তান্ত্রিক আচারে সর্ব্বাপেক্ষা অনুরক্ত এবং সিদ্ধ, এমন রাঢ়ীয় ১৯ জন এবং বারেন্দ্র মাত্র ব্রাহ্মণকে কুলীন এবং অপর সকলের মধ্যে যাঁহারা উক্ত জনের জ্ঞাতি ও সমগ্রামী, তাঁহাদিগকে বংশজ অর্থাৎ কুলীন-বংশজ এবং তদ্ব্যতীত অপর সকলকে শ্রোত্রিয় আখ্যা দান করিলেন। কৌলাচার তন্ত্রাচারের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার বলিয়া তৎকালে গণ্য হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কৌলগণই তন্ত্রমতে কুলীন। বল্লাল সেন নিজে তান্ত্রিক ও তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য বলিয়া, রাজ্যমধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র যে জনকে কুলীন আখ্যা দিয়াছিলেন, তাহারাই হয় ত তখনকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৌল ছিলেন। কুলাচার, কৌল প্রভৃতি শব্দ হইতেই তন্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠত্ববাচী কুলীন শব্দের উৎপত্তি। শ্রোত্রিয় শব্দের অর্থ—বেদবিৎ। হয় ত এমনও হইতে পারে, তন্ত্রাচারকে প্রাধান্য দিবার জন্য তান্ত্রিক রাজা ও রাজগুরু পরামর্শ করিয়া কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা তখনও বেদাচার রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-সংজ্ঞা শ্রোত্রিয় নাম লোপ না করিয়াই "শ্রোত্রিয়ত্ব"কেই দেশের মধ্যে হীন-মর্য্যাদ করিয়া দিলেন। এই শ্রোত্রিয়েরও আবার উত্তম, মধ্যম, অধম—শুদ্ধ, সাধ্য ও কষ্টশ্রোত্রিয় নামে তিনভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন! কে বলিতে পারে, যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে বেদাচার প্রতিপালন করিতেন, রাজচক্রান্তে তাঁহারাই কুলীন-শত্রু কষ্টশ্রোত্রিয় আখ্যা পান নাই? হয় ত এই জন্যই ব্যবস্থা হইয়াছিল, কুলীনেরা বংশজ কন্যা ও কষ্ট-

শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণে কুলভ্রষ্ট হইবেন ; আর শ্রোত্রিয়ের পক্ষে ব্যবস্থা হইল, শ্রোত্রিয় কুলীনপাত্রে কন্যাদান করিলে সম্মানিত হইবেন। রাজার এই ব্যবস্থায় আবার পাত্রবিভ্রাট্ ঘটিল। বংশজ ও কষ্ট-শ্রোত্রিয়েরা অধিক অর্থদান করিয়া কুলীনের কুলভঙ্গ করিয়াও নিজেদের জন্য সম্মান ক্রয় করিতে লাগিলেন। কুলীনেরা কুলীনকন্যা ও শ্রোত্রিয়-কন্যা ত পাইতেনই, আবার কুলনাশে স্বীকৃত হইলে, বংশজ ও কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্যা অর্থ ও বিত্তসহ পাইতেন ; কিন্তু শ্রোত্রিয় ও বংশজের পাত্রীর অভাব হইতে লাগিল। এই সূত্রে বংশজেরা অর্থলোভে শ্রোত্রিয় ও বংশজ পাত্রে কন্যাদান না করিয়া তাঁহাদের নিকট কন্যাবিক্রয়ী হইয়া উঠিলেন। ক্রমশঃ বংশজের কন্যাবিক্রয় এবং কুলীন পাত্রের কুলনাশক বিবাহে সৎকুলীনে কন্যাদিগের পাত্রাভাব ঘটিতে লাগিল। তখন রাজবিধি বলবৎ থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত অরজস্কা কন্যাদান বন্ধ হইয়া অবিবাহিতা অধিকবয়স্কা কুলীন-কুমারীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই গণ্ডগোল যুগাবতার চৈতন্যদেবের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। চৈতন্য-জন্মের ২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বে ঘটকরাজ দেবীবর কেবল রাঢ়ীয় কুলীন-কুমারীর পাত্র-ব্যবস্থা সুলভ করিবার জন্য, বল্লাল-বিধি অনুসারে কুলভ্রষ্টগণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং দেশের নূতন রাজ-শক্তি মুসলমান অত্যাচার-জনিত, সাহচর্য্য-জনিত, দূষিত ব্রাহ্মণবংশগুলির ব্যবস্থা করিবার জন্য, অর্থাৎ তাহাদিগকে বাছাই করিয়া সমাজের মধ্যে স্বতন্ত্র স্থান দিবার জন্য, মেল বন্ধন করিলেন। "দোষাণাং মেলকো মেলঃ।" সমদোষাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বাছিয়া এক একটি করিয়া ছত্রিশটি মেল বাঁধিলেন। "তেজীয়সাং ন

দোষায়,”—“অগ্নিতে পড়িলে শুদ্ধ হয় সর্ব্বজন” ইত্যাদি বচনের জোরে এতদিন দেশের যত বড় বড় পণ্ডিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণপুঙ্গব কুলবিধি, ধর্ম্মবিধি, সমাজবিধি উপেক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কাজেই মেল-বন্ধনের সময়ে দেবীবরের সমসাময়িক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা বড় কুলীন-বংশধর ও যাঁহারা পণ্ডিত বা প্রতিপত্তিশালী, তাঁহাদেরই অধিকাংশ বেশী দোষাক্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া, একটা না একটা মেলের মধ্যে নিবিষ্ট হইলেন। যাঁহারা মেলের বাহিরে বাহিরে রহিলেন, ধরিতে হইবে, দেবীবর তাঁহাদের বিশেষ মারাত্মক অর্থাৎ মেলভুক্ত করিবার মত কোন দোষ পান নাই। অমেলী কুলীন-সমাজের মধ্যে নগণ্য, নিরীহ, দরিদ্র, সদাচার ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী ছিল, এরূপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। দেবীবরের সংস্কার বা মেলবিধি ইঁহাদের স্পর্শ করিল না, হয় ত করিবার আবশ্যকই ছিল না। মেলী কুলীন-সমাজের দোষ সমাজের সদাচার ব্রাহ্মণের মধ্যে বা এক মেলের দোষ অপর মেলে সংক্রামিত না হয়, এজন্য প্রতি মেলের প্রকৃতি-পালটী বা পরিবর্ত্ত-প্রথার বিধান করিয়া দেবীবর অতি উৎকৃষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। এইরূপে ১৪শ শতাব্দীতে রাজশক্তির সাহায্য না পাইয়াও, কেবল ঘটকের আসনে বসিয়া দেবীবর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে মেলবিধি প্রচলিত করিয়া, যেভাবে সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত করেন, সেইভাবে বারেন্দ্র-সমাজে পণ্ডিতাগ্রগণ্য উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কাপ ও পঠি ভাগ করিয়া সমাজ-সংস্কার করিয়াছিলেন। কালে সকলবিধিই বলবৎ রাখিবার শাসনশক্তির অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে। পাণ্ডিত্য ও প্রতিপত্তিবলে বলীয়ান থাকায়, মেলী কুলীন-সমাজ দোষাশ্রিত বলিয়া

প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেশের শ্রদ্ধা-ভক্তি-চ্যুত হইল না, কাজেই তাঁহারা প্রবল থাকিয়া অমেলী কুলীন-সমাজকে "দেবীবর-ছাঁটা বংশজ" আখ্যায় বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। সমশ্রেণীস্থ প্রবলের অত্যাচারে এবং দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ বেদাচার পরিত্যাগে ক্রমশঃ অমেলী সমাজও মেলী কুলীন-সমাজে মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। এখন দেশে বল্লাল-বিহিত আদি বংশজগণের ও দেবীবর-ছাঁটা বংশজগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। এরূপে দেবীবরের অতি অল্পদিন পরেই কুলভ্রষ্ট, রণ্ড, পিণ্ড, বলাৎকার-দোষ-সংযুক্ত, যবনান্নগ্রহণ ও যবন-পরিবাদগ্রস্ত বহুবিধ দোষসমন্বিত মেলী কুলীনেরাই দেশের মধ্যে কৌলীন্যের স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। লম্বা-গলায় দোষগুলিকেই গৌরবের ও মহত্ত্বের পরিচয়স্থল করিয়া চলিতে লাগিলেন। আমি ফুলে মেলের কুলীন, আমি খড়দহ মেলের কুলীন, আমি ছায়ানরেন্দ্রী মেলের কুলীন, আমি চট্টরাঘবী মেলের কুলীন—ইত্যাদি। কি কি বিষম দোষে এই সকল মেলের সৃষ্টি হইয়াছিল, সাধারণতঃ কুলীন-সমাজ ও ঘটকগণ ব্যতীত আর কেহ বড় স্মরণ রাখে নাই ; তাই তাঁহাদের এরূপ মিথ্যার উপর, ভ্রষ্টাচারের উপর গৌরবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিতেন না, অথবা ভাবিলেও গৌরবের আবরণ দিয়া একটা সামাজিক বিষম দণ্ডকে লুকাইতে চেষ্টা করিতেন। দেবীবর ঘটক মেলের নামে মেলী কুলীন-সমাজকে বংশানুক্রমে পরিচয় দিতে বাধ্য করিয়া কৌশলে এমন ভীষণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন যে, পুরুষপরম্পরায় সহজভাবে এবং স্মিতমুখে স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে যে, আমি অমুক মেলের কুলীনবংশধর, অর্থাৎ আমার পূর্ব্বপুরুষ এই মেলের

গঠনহেতু অমুক অমুক মহাদোষের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। যাঁহারা এইরূপে ফুলে মেল বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান বলিয়া দেশে দশের নিকটে আত্মগৌরব প্রকাশ করেন, তিনি ভাবেন না যে, তদ্রূপ পরিচয় দ্বারা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষকৃত “নান্দা ধান্দা বারুইহাটী মুলুকজুরী” এই চারিটি মহাদোষেরই ঘোষণা করিতেছেন। নিজকৃত পাপের কীর্ত্তন নিজে করিলে পাপ নষ্ট হয়, এইরূপ একটা ঋষিবাক্য আছে; তদনুসারে মেলী কুলীন-সমাজের বংশধরেরা আজ চারিশতাধিক বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি সে প্রায়শ্চিত্তটা বিধিমত প্রকারেই করিয়া আসিতেছেন। বলিয়া রাখা ভাল, এই প্রলাপ-লেখকও ফুলে মেলের সন্তান। রাঢ়ীয় সমাজের ন্যায় বারেন্দ্র-সমাজেও ঠিক এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। যাক্, কথায় কথায় আমরা অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি। অতঃপর মেলী কুলীন-সমাজ অর্থ-বিত্ত-লাভের আশায় বংশজ-কন্যা গ্রহণ করিয়া ভঙ্গ হইতে লাগিলেন। এই সকল ভঙ্গ কুলীনপাত্রে কন্যাদান করিয়া বংশজ ও শ্রোত্রিয়েরা কুলীনে কন্যাদানের গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। কৌলীন্য বিধি-অনুসারে নিকষ কুলীন-পাত্র শ্রোত্রিয়ের পক্ষে দুর্লভ ছিল না, কিন্তু বংশজের একান্ত অপ্রাপ্য ছিল। বংশজেরা ও কষ্টশ্রোত্রিয়েরা অর্থবলে কোন কুলীনের কুলভঙ্গ করিতে না পারিলে, নিকষ কুলীন-পাত্রে কন্যাদানের গৌরব লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিত না। কাজেই তাঁহারা এইরূপে কোন ভঙ্গ-কুলীনে (প্রকৃত-প্রস্তাবে কুলভ্রষ্ট অ-কুলীনকে) কন্যা-দান করিয়াও কুলীনে কন্যাদানের অভিনয় করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের ব্যয়ও কিছু লঘু হইত। এই সময়ে বিদ্যা-ব্রহ্মণ্যের

খ্যাতি সাধারণতঃ কুলীন-সমাজে বিশেষতঃ, বংশজ-সমাজ হইতে লোপ পাইল। তখন কুল-গৌরবকে মূলধন করিয়া ভঙ্গ-কুলীনেরা স্বকৃতভঙ্গ, স্বকৃত-ভঙ্গের পুত্র, স্বকৃত-ভঙ্গের পৌত্র, তৎপরে চারি পুরুষে, পাঁচ পুরুষে কুলীন বলিয়া আপনাদের পুরুষানুক্রমে কৌলীন্যের দাবী রাখিয়া বিবাহ-ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভঙ্গ-কুলীনের ৭ম পুরুষ অতীত হইলে, তিনি আর কুলীনত্বের দাবী করিয়া সম্মান বা বিবাহ-ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারিতেন না। তখন তাঁহাদের নিজেদের কন্যাদানের অন্তরায় ঘটিত এবং স্ববংশের আদি শ্বশুর বা মাতামহদত্ত বিত্ত ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমে বিভাগবশে ক্ষয় হওয়াতে, কুলীন-পাত্রে যাঁহারা কন্যা দিতে পারিতেন না, তাঁহারা নিজেদের অনুরূপ বংশজ-পাত্রে বা কষ্ট-শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কন্যাপণ দিয়া কন্যাক্রয়ও অনেকের ভাগ্যে দরিদ্রতা বশতঃ ঘটিত না। তাহাতে অনেক বিখ্যাত বংশ লোপ হইতে লাগিল। ওদিকে অর্থলোভে নিকষ কুলীনেরা ভঙ্গ হইয়া বিবাহ-ব্যবসায় আরম্ভ করায়, মেলী কুলীন-সমাজে স্বমেলের পালটী ঘরে পাত্রাভাব ঘটিল। অনেকে এই জন্য মেলান্তরে বিবাহ দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতে লাগিলেন। ইহাতে দেবী-বরের শাসন-বিধি অনুসারে শ্বশুরকে "মেলকাটী" দোষে জামাতৃমেল গ্রহণ করিয়া কুলীন-সমাজেও কতকটা হীন-মর্য্যাদ হইতে হইল। দেবী-বর সমাজ-সংস্কারের জন্য যে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন, তাহার সুফল কিছুদিন চলিয়াছিল। তৎপরে বল্লাল-বিধির অপব্যবহারে কুলীন-সমাজের একদিকে যেমন কুলনাশ, দোষাশ্রয় ও কুলীন-পাত্রের পাত্রাভাব, অন্যদিকে বংশজ-শ্রোত্রিয়ের পাত্রীর অভাব ঘটিয়াছিল। দেবীবরের

মেল-বিধির অপব্যবহারে এ দুই দিকে ঠিক সেই সকল দোষই ঘটিতে লাগিল; অধিকন্তু কন্যা-বিক্রয়, বহুবিবাহ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে ভীষণ কলঙ্ক চাপাইয়া দিল। এই সকল দোষ সংক্রামিত হইয়া মেলী কুলীন-সমাজকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। আরও উত্তর কালে আর কয়েক জন ঘটক-চূড়ামণি ঐ সকল দোষা-দোষ বিবেচনা করিয়া মেলী কুলীন-সমাজে আবার কতকগুলি ভাব, থাক, যূথের ভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তারপর সমাজ ঐ এক ভাবেই চলিতেছিল। পরে ক্রমশঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বর্ত্তমান অর্থদৈবত কৌলিন্যের উপাসনা পাত্রাভাব ঘটাইয়া তুলিয়াছেন। পাত্রাভাবের ইতিহাস দেখিতে গেলে, আমাদের দেশে প্রায় সকল কালেই একভাবে চলিয়া আসিতেছে; কাজেই এখন আক্ষেপ করিলেই বা ফল কি হইবে? আবার একটা বল্লাল বা দেবীবরের মত শক্তিশালী পুরুষ আসিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে, আবার কিছুদিন এ দুর্দ্দশার প্রতিকার হইবে না। তবে দেখা যাইতেছে, যিনি যখনই সংস্কারবিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, কিছুদিন পরে কন্যাপক্ষের আগ্রহকে অবলম্বন করিয়া বরপক্ষ অর্থকেই আপনাদের শ্রেষ্ঠ মূল্য স্থির করিয়া অনর্থ ঘটাইয়াছেন। আবার শাস্ত্রগ্রন্থপাঠে জানা যায়, কন্যাপণ-গ্রহীতার, কন্যাবিক্রয়ীর, শুক্রবিক্রেতার যেরূপ নিন্দা ও ইহলোকে এবং পরলোকে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে যে, তৎকালে "দুষ্করো দারসংগ্রহঃ"র নিমিত্ত বরপক্ষকে কতই না ব্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত, তাহা আমরা শ্রাদ্ধ-কালে রুচিরোপাখ্যানে জানিতে পারি। হইতে পারে, এই জন্যই "অষ্ট-বর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঃ ঊর্দ্ধং

রজস্বলা ॥”—নিয়মটা বিধিবদ্ধ করিয়া মেয়েটার আট বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার পিতামাতাকে গৌরীদানের ফললাভে প্রলোভিত করিয়া দারসংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; আর এই সময়েই কন্যাশুল্কদান-রূপ কুৎসিত প্রথা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, কন্যাপণ-গ্রহীতাকে কন্যা-বিক্রয়ী, শুক্রবিক্রয়ী বলিয়া সমাজে নিন্দিত, পতিত এবং অন্তে ভীষণ নরকগামী করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল এবং আধুনিক কালে সামান্য কথায় কন্যাবিক্রয়ী বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রিয়দিগকে ‘পাঁটীবেচা’ নাম দিয়া ঘৃণা করা হইত। অতএব দেখা গেল, কি প্রাচীনকাল, কি মধ্য-কাল, কি ইদানীন্তন কাল—সর্ব্বকালেই দারকর্ম্মে অর্থাৎ বিবাহ-ব্যপারে একপক্ষ অর্থকে স্বার্থের পরমার্থ করিয়া তুলিয়াই অনর্থ এবং পাত্র-পাত্রী-সংগ্রহে বিভ্রাট ঘটাইয়া তুলিয়াছেন। এই মূল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যদি কেহ মূলেই কুঠারাঘাত করিবার কোন উপায় করিতে পারেন, তবে যদি কোন প্রতিকার হয়। এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে মাতৃদেবী বলিলেন, “বড় খুকীকে পাত্রপক্ষের পছন্দ হইয়াছে, তাহারা নগদ কিছুই লইবে না, তবে বিবাহের জন্য তাহাদের যাহা ব্যয় হইবে, সেটা বোধ হয়, দিতে হইবে।” আমি মনে মনে বলিলাম,—‘এবমস্তু।’

১২

একদিন মনে হইল,—আমাদের ইতিহাস নাই কেন? বেদ আছে, স্মৃতি আছে, পুরাণ আছে, দর্শন আছে—কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, গণিত, আয়ুর্ব্বেদ, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি যা কিছু আবশ্যক, তা সবই আছে, আর তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রশংসনীয় অবস্থাতেই আছে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যাহাকে ইতিহাস বলেন, তেমন ইতিহাস নাই কেন?—ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, আমাদের রাষ্ট্র-নীতি, দেশনীতি, সমাজনীতি, পারিবারিকনীতি এবং ব্যক্তিগতনীতি এমনভাবে ধর্ম্মের সঙ্গে বিজড়িত, ধর্ম্মের শাসনে অনুশাসিত যে, উহার কোনটিরই উন্নতির জন্য তেমন ইতিহাসের প্রয়োজন আমাদের হয় নাই, আর হইতেছেও না। আমরা সৎ ও সত্যের এতটা পক্ষপাতী হইতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে, আমাদের কাছে ব্যক্তি ও কালের অবচ্ছেদ আর মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। বেদ ও উপনিষৎ, পুরাণ ও স্মৃতিই আমাদের সকল ইতিহাস—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও নৈতিক ইতিহাসের স্থান পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, আর তাহাতেই ইউরোপীয় প্রথার ইতিহাস-বিশিষ্ট কোন জাতি অপেক্ষা আমাদের ঐতিহাসিক-শিক্ষার কোন তারতম্য হইতেছে না। আমাদের পুরাণ যদি 'কোন এক দেশের কোন এক রাজা কোন এক সময়ে এই সৎকার্য্য করিয়া বা এই অসৎকার্য্য করিয়া এইরূপ ফল পাইয়াছিলেন'—এইরূপ অস্থিত-পঞ্চকভাবে উপদেশ দেয়,

আমরা তাহাতে কোন অভাব বা ক্ষুণ্ণতা মনে করি না! কার্য্যের ফলাফল লইয়া শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হয়,—সেই ফলাফলটিই যখন জানিতে পারিলাম, তখন তাহা হইতে যাহা শিক্ষণীয়, তাহাও জানিতে পারিলাম, সুতরাং সে ঘটনা কোথায়, কবে, কখন, কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই বা তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের কোন ইতরবিশেষ হইবেও না বলিয়া, তাহা পুরাণকার যথাযথ রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। শরণাগত-রক্ষার্থ শিবি রাজা আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর তার ফলে তাঁহার সদ্গতি হইয়াছিল, এইটুকুই লোকশিক্ষার বিষয়,—পুরাণকার ইতিহাস বলিয়া এই সত্যটুকুই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। রাজা শিবি চেদিরাজ ছিলেন, কি পাঞ্চালরাজ ছিলেন, কি প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ ছিলেন, অথবা তিনি খৃষ্টের পাঁচ হাজার বা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বা পরে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত রক্ষায় তাঁহারা আদৌ মনোযোগী হন নাই; লোকশিক্ষায় যে তথ্যগুলি কোনই সাহায্য করিবে না বলিয়া, তাহা রক্ষা করিবার কোনও আবশ্যকতাই অনুভব করেন নাই। পৃথুপুত্র বেণরাজার সময়ে বর্ণসঙ্কর জাতিসমূহের বৃত্তিবিধান ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং রাজদোষে বর্ণসঙ্কর জন্মাইয়া সমাজে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল বলিয়া, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উরুমন্থন দ্বারা তাহার প্রতিকার ঘটাইয়াছিলেন, —রাজদোষে রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব ঘটে এবং তাহার ফলাফল বর্ণনা করিয়া লোকশিক্ষায় ইতিহাসের যতটুকু প্রয়োজন, পুরাণকার ততটুকুই রক্ষা করিয়া বেণরাজের রাজ্য ও কালাকাল সম্বন্ধে কোন কথাই রক্ষা করেন নাই। পুরাণ ছাড়িয়া দিলেও আমাদের নিকটবর্ত্তী

কালেও ভারতীয় ইতিহাস-রক্ষার ধারা আজিও ঐরূপই চলিয়া আসিতেছে। কালিদাসের কাব্যই শিক্ষণীয় ও পঠনীয়; তিনি খৃষ্টের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে কি খৃষ্টের পর ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মিয়াছিলেন, তাহা জানিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া, তাহার কোন সূত্রও রক্ষিত হয় নাই। আর এখনকার গবেষণা-বলে যদি কোন একটা বৎসর কালিদাসের জন্ম বা রঘুবংশ-রচনার বৎসর বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তবে কালিদাসের কাব্য-মহিমা যে কিছু বাড়িবে, বা রঘুর ন্যায় আদর্শ রাজার সৎকীর্ত্তি সম্বন্ধে আমরা আর কিছু অধিক জানিতে পারিব, তাহা নহে। কেহ কাশ্মীরের মাতৃগুপ্তকেই কালিদাস বলুন, আর বাঙ্গালার বর্ণনায় কালিদাসকে বিশেষ পক্ষপাত করিতে দেখা যায় বলিয়া, কেহ তাঁহাকে বাঙ্গালীই প্রমাণ করুন, তাহাতে মারাঠা বা দ্রাবিড়ের লোকের শিক্ষার কিছু ক্ষতি হইবে না। কাশ্মীর বা বাঙ্গালা দেশের লোক তাহাতে কালিদাসকে আমাদের বলিয়া গৌরব করিতে পারিবে বটে, কালিদাসের কাব্যাদিগত শিক্ষার পরিমাণ যে কিছু বাড়াইতে পারিবে, তাহা নহে; বরং গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া একদিন হয় ত গর্ব্বে অভিভূত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে। বৈদিক ঋষি, পৌরাণিক ঋষি-মুনি, স্মৃতির ব্যবস্থাপক ঋষি-মুনি কে বাঙ্গালী, কে উড়িয়া, কে কাশ্মীরী, কে খোরাসানী, কে আফ্‌গান, কে পারসীক, কে বেলুচী, কে সাইবিরীণ (তিলকের মতে), কে মঙ্গোলীয় (উমেশ বিদ্যারত্নের মতে), ইউরোপীয় প্রণালীতে ঐতিহাসিক গবেষণা করিতে শিখিয়া, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আমরা এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর, দৈত্য, অসুর প্রভৃতি দেবযোনিদিগকে পুরাণ-

মতে আর আমরা স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোকের অধিবাসী বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; থিয়সফির দোহাই দিয়া ইংরেজীতে order of the 5th plane, order of the 7th plane বলিয়া না বুঝিলে তৃপ্তি পাই না; অথচ দু'টাতেই তাঁহাদের লিখিত জ্ঞানোপদেশের যে কোন প্রসারতা হইতেছে, তাহা নহে— যে তিমিরে, সে তিমিরেই আছি। তপস্যালব্ধ লোকালোকের জ্ঞান কেবল উপদেশে যাহা হইবার, তাহার ইতর-বিশেষ কি পুরাণ, কি থিয়সফি, কিছুতেই হইতেছে না,—উভয়েই বলেন, সাধনা কর, তপস্যা কর, বুঝিতে পারিবে। ভারতচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন, "কথায় কে করে প্রত্যয়"—"করি দেখ বুঝিবে তখনি।" ইউরোপীয় ইতিহাসের দেশ-কাল-পাত্র-সাক্ষ্য-প্রমাণবদ্ধ ঘটনাবলীর শিক্ষাও যে পুরাণোক্ত ইতিহাসের শিক্ষা অপেক্ষা আর বেশী-কিছু শিক্ষা দিতে পারে, তাহা ত বোধ হয় না। পুরাণ বলেন, রাবণ অসাধারণ শক্তিবলে, দম্ভবলে সসাগরা ধরণী চুলায় যাউক—ত্রিলোক জয়ও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে পাপে, অহঙ্কারে, রাজশক্তির অপব্যবহারে সবংশে ধ্বংস হইলেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় ও নেপোলিয়নের ইউরোপ জয়ের ব্যাপার হইতেও তাহার অতিরিক্ত আর কি অধিক শিক্ষণীয় বস্তু পাওয়া যায়, তাহা ত বোধ হয় না। এই শিক্ষার জন্য তাঁহাদের দেশ-কাল-পাত্রের সঠিক সংবাদ যে খুব একটা বেশী কার্য্যকর হয়, তাহা মনে হয় না। আলেকজাণ্ডার গ্রীক না হইয়া তুর্কী বা জিপ্‌সি এবং নাপোলিয়ঁ ফরাসী না হইয়া পারসী বা ভীল হইলে এবং একজন খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দী বা অপর জন খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীতে না জন্মিয়া

হিন্দুর কল্পিত লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের সত্যযুগে জন্মিলেই তাঁহাদের দিগ্বিজয়, রাজ্যপালন, বীরত্ব, মহানুভবতা, দাম্ভিকতা, অত্যাচার, পৃথিবীব্যাপী বীরক্ষয় প্রভৃতির যে ইতিহাস আমরা আজ পাইয়া তন্মধ্য হইতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত শিক্ষা পাইতেছি, তাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইত, তাহা ত বুঝি না। দাশরথি রামচন্দ্র কবে ছিলেন, তাহা হিন্দুও বর্ষমাস ধরিয়া দিন স্থির করিয়া বলিতে পারেন না, কিন্তু "রামের মত স্বামী হউক, লক্ষ্মণের মত দেবর হউক"—এ প্রার্থনা, এ শিক্ষা হিন্দুনারী ত আজও ভুলে নাই, "জয় রাজা রামচন্দ্র কি" বলিয়া তাঁহার মহত্ত্ব স্মরণে কোন হিন্দু কোনমাত্র অভাব বোধ করে না, কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসে কত শত পরোপকারী সত্যব্রত আদর্শ পুরুষের আজন্ম মরণের কার্য্যাবলী দিন-মাস-বৎসর ধরিয়া ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিলেও কই কেহ ত হিন্দুর ন্যায় তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া লইতে পারে নাই! তবে একটা মনে হইতে পারে দেশ-কাল-পাত্রের জ্ঞান থাকিলে, কেহ কেহ মনে করেন, বিশ্বাসের মাত্রা অধিক এবং দৃঢ় হয়। ইহা কল্পনার কথা। উত্তরকালবর্ত্তী লোকের পক্ষে পূর্ব্বকালবর্ত্তীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত অন্য গত্যন্তর নাই। একজনের কথায় বিশ্বাস না কর, দশজনের কথায় বিশ্বাস করিবে কি প্রকারে, তাহা ত বুঝিয়া পাই না!—যুক্তি ত এই, দশ জনেই কি মিথ্যা কথা বলিবে?—গ্রীক্‌বীর হারকিউলিসের বীরত্ব-কাহিনী সত্য, কি মিথ্যা—পুরাণকল্পিত ব্যাপার কি না, তাহাই নির্ণয়ে ইউরোপীয় শিক্ষিত-সমাজ এখন ব্যস্ত, কারণ, হারকিউলিসের ইতিহাস দেশকালের সীমা দিয়া সংবদ্ধ করা নাই। বহুদূর অতীতকালে উল্লিখিত দেশকালের

প্রতি অর্ব্বাচীন কালের লোকের যে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসে, ইহা বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে প্রত্যহ যখন অনুভূত হইতেছে, তখন কোন দুর ভবিষ্যতে নাপোলিয়ঁর বিবরণও যে পৌরাণিক জল্পনার ন্যায় দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা অবচ্ছিন্ন থাকিলেও অশ্রদ্ধালাভ করিবে না, তাহা কে বলিল? দৃষ্টান্তস্বরূপ ইউরোপে মুসলমান-রাজত্বের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হয় না কি? সেরূপ দেশ-কাল-পাত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণের কথায় হিন্দুর যুক্তি এই যে, লোক-শিক্ষার্থ ইতিহাস-পুরাণ রচনা করিতে বসিয়া সেই একজনেই যে মিথ্যা কথা বলিবে, এ সন্দেহই বা করি কেন? অকিঞ্চিৎকর বলিয়া একের ব্যবহার দেশ-কাল-পাত্রের সাক্ষ্য হিন্দু ত্যাগ করিয়াছে। আর মিথ্যা! মিথ্যার কি শিক্ষা নাই?—এখনকার কালেও কি মিথ্যাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া হয় না! গল্প বলিয়া ইন্দুর কাক বিড়ালের কথা বলিয়া শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা কি কল্পনামূলক মিথ্যা কথা নহে? এদেশের ধাতু গড়িয়া গিয়াছে, ইহারা সারগ্রহণে পটু, সৎকথা বলিয়া দৃষ্টান্তসহ যাহা উপদেশ দিবে, তাহাই ইহারা গ্রহণ করে। দৃষ্টান্তের প্রমাণ খুঁজিয়া এদেশের লোক অনর্থক শিক্ষার সময় নষ্ট করে না। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের রাজনামমালায় পুরাণে পুরাণে বিভিন্নতা দেখা যায়। তজ্জন্য হিন্দুর ইতিহাস-শিক্ষায় কোন ক্ষতি হয় না। নামমালার পৌর্ব্বাপর্য্য বা নাম-সমতায় শিক্ষার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়, হিন্দু তাহা মনে করে না। কোন্ রাজা কি সদসৎ কর্ম্ম করিয়া কি ফলাফল পাইয়া গিয়াছেন, তাহাই পৌরাণিক শিক্ষার লক্ষ্য। সেই ফলাফলের শিক্ষার উপরেই হিন্দু-সমাজের গঠন নির্ভর করে। আদি প্রজাপতি

হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কোন রাজ-বংশাবলীর নামমালার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষায় ও তাহা ছাত্রগণের অভ্যাস করার উপর কোন শিক্ষা নির্ভর করে না, হিন্দুর এইরূপ বিশ্বাস। এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় নবপ্রকাশিত গৌড়রাজমালার একটা স্থান নজরে পড়িল। তাহাতে দেখিলাম,—আদিশূরের অস্তিত্বতেই গ্রন্থকারের সন্দেহ হইয়াছে। কেন না, তাঁহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এখনও দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয় নাই। সুতরাং বাঘ-বকের গল্পের মত আদিশূরের ব্যাপারটাকে গল্পকথা বলিয়া উড়াইয়া দিলে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; কিন্তু আদিশূরের নামের সঙ্গে এদেশের বেদাচারভ্রষ্ট অবস্থায় যে অন্য দেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া দেশাচারের সংস্কার-চেষ্টা, লোকশিক্ষার ব্যবস্থা, রাজোচিত প্রজাপালনশক্তির পরিচালন প্রভৃতি শিক্ষণীয় কথার সংশ্রব আছে, সেগুলা ত্যাগ করা ইতিহাসের পক্ষে উচিত কি না এবং ত্যাগ করিলে বাঙ্গালায় ইতিহাস-শিক্ষার ক্ষুণ্ণতা আসিবে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আদিশূরকে যতক্ষণ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক-বিজ্ঞান-বলে দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া লইতে না পারিতেছি, ততক্ষণ তিনি নাই; কিন্তু তাঁহার নামে আরোপিত এই যে এক মস্ত সৎশিক্ষার ব্যাপার বিজড়িত আছে, তাহা কি ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া অন্ততঃ বাঘ-বকের গল্পের ন্যায় সদুপদেশ দিবারও অধিকারী নহে? ঐরূপ অবচ্ছেদের জ্ঞান না থাকিলে, এতন্নিহিত শিক্ষাও কি ফলদায়িনী হইবে না?—এত ভাবিয়াও কি স্থির করিব বুঝিলাম না, কাজেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—'এবমস্তু।'

১৩

একদিন মনে হইল,—যখন সত্যযুগের চারিপোয়া ধর্ম্মের শৃঙ্খলা ত্রেতাযুগে ক্ষয়িত হইয়া তিন পোয়ায় এবং দ্বাপরে দুই পোয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর সেই সকল ভ্রষ্টাচার নিবারণের জন্য, পৃথিবীকে পাপভার হইতে মোচনের জন্য ভগবানকে যুগে যুগে অবতার হইয়া কত কাণ্ডকারখানা বাধাইতে হইয়াছে এবং তাহা পুরাণকারের কথায় আমরা বিশ্বাস করিয়া মানিয়া আসিতেছি, তখন কলিকালের এই তিন পোয়া পাপের আক্রমণ-জনিত ভ্রষ্টাচারের জন্য আমরা ক্ষুণ্ণ হইতেছি কেন? যে শাস্ত্রের কথায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ইতিহাস বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, সেই শাস্ত্রেই যখন কলিকালের জন্য এই ভ্রষ্টাচার ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন তাহা বিশ্বাস না করিয়া আমরা ইহার জন্য এত বিমর্ষ হই কেন? তারপর সেই শাস্ত্রেই কলির ব্রাহ্মণ, কলির রাজা, কলির রমণী কেমন হইবে, তাহা যখন ভগবদ্বাক্যচ্ছলে পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার অন্যথা কল্পনা করি কেন? আমরা এ প্রথার পরিবর্ত্তন করিব, বেদহীন কলির ব্রাহ্মণকে বেদশিক্ষা দিয়া আবার সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিব, এ সকল কল্পনা করিয়া মস্তিষ্ক বৃথা পীড়িত করি কেন? ইহা দ্বারা কি আমাদের ভগবদ্বাক্য হেলন, ভগবদ্বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা হয় না? তদ্ভিন্ন আর এক কথা আছে! ভ্রষ্টাচার ও পৃথিবীর পাপভার লাঘবের জন্য ভগবান্ নিজেই অবতার হইয়া সে

কার্য্য সম্পাদন করেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটা তাঁহারই শ্রীমুখ-বিনির্গত ; অতএব যাঁহার কার্য্য, তাঁহারই জন্য রাখিয়া দিয়া, আমরা যদি অনধিকারচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া সার্ষপ-নিদ্রা ভোগ করি—বর্ণাশ্রমাচার সংস্থাপন, পতিত জাতির উদ্ধার, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলন, নিষিদ্ধভোজন বিচার, প্রভৃতি বড় বড় সামাজিক সংস্কারের কথায় নাচিয়া না বেড়াই, শাস্ত্রানুসারেই আমাদের কোন অকর্ম্ম করা হইবে না। ইহার নজীরও আছে। যে কলিকালের সংস্কারের কথা আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি, সেই কলিকালের অবতার-সম্পর্কেই সে নজীর পাইয়াছি। কলিকালের বিষ্ণুর দুই অবতার—বুদ্ধ ও চৈতন্য। বুদ্ধকে পুরাপুরি অবতার বলিয়া হিন্দুসমাজ দশাবতারের শ্রেণীতে আসন দিয়া মানিয়া লইয়াছে, চৈতন্যের অবতারত্ব এখনও "হ্যসংখেয়াঃ"র মধ্যে ঘুলাইয়া রহিয়াছে। তা থাকুক, তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ কলি-সন্ধ্যার অর্দ্ধেক দিন যাইতে না যাইতে, দ্বাপরযুগ-ব্যবস্থা (দুই পোয়া ধর্ম্মও) যখন বেশ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে, বুঝিতে পারা গেল, তখন বুদ্ধদেব আসিলেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বে যাঁহারা ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহারা পৃথিবীর ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া, "সমাজ-সংস্কারের" চেষ্টা না করিয়া, ঋষিপত্তনে নিরালায় বসিয়া বুদ্ধদেবের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার পর যাহা করিতে হইল, তাহা বুদ্ধাবতার স্বয়ং আসিয়া করিয়াছিলেন। সেইরূপ চৈতন্যাবতারের পূর্ব্বে যাঁহারা "পাষণ্ডী জনার" অত্যাচারে উৎপীড়িত এবং ধরণীকে নিপীড়িত দেখিয়া ক্লেশানুভব করিতেন, সেই অদ্বৈত-শ্রীবাস-চন্দ্রশেখরাদি গোপনে

শ্রীবাসের বা অদ্বৈতের আঙ্গিনা কাঁদিয়া ভিজাইতেন। তাঁহারা তখনকার ম্লেচ্ছ-রাজের সাহায্যে সতীদাহ-প্রথা নিবারণ, গঙ্গাসাগরে পুত্রনিক্ষেপ, রাজপুতের কন্যাহত্যা, চড়কপূজায় বাণ-ফোঁড়া প্রভৃতি সমাজের অনিষ্টকর কুসংস্কারগুলির সংস্কার কল্পনা করিয়া কোন আইন পাশ করাইবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। তাঁহারা প্রাণের ব্যথায় প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেন, আর ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিতেন। হইলও তাই; সেই চৈতন্য আসিয়া যাহা করিতে হয়, করিয়া গেলেন। সে আজ ৫০০ বৎসরের অনধিক কালের কথা, তখনও কলির সন্ধ্যাকাল শেষ হয় নাই; অর্থাৎ তখনও দ্বাপরের ছায়া অতি ক্ষীণভাবে কোথাও কোথাও (একান্নবর্ত্তিতায়, পূর্ত্ত ও পৈত্র্য-কার্য্যে, বর্ণধর্ম্মে এবং আরও কোন কোন ব্যাপারে) কিছু কিছু ছিল। তখন বোধ হয়, সেই জন্যই আমরা খোদার আইন নিজের হাতে গ্রহণ করি নাই। এখন কলি-সন্ধ্যার ৫০০০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন পুরা কলিকাল আসিয়া পড়িয়াছে। এখন পুরাদমে ভাগবতোক্ত ও তন্ত্রোক্ত ‘তদৈব প্রবলঃ কলিঃ’ দেখা দিয়াছে। তাই কি আমাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে!

১৪

একদিন মনে হইল,—আমরা ভারতবাসী এমন পতিত কেন? যে যুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সকল দিকে উন্নতিলাভের জন্য কত শত উপায় অবলম্বন করিতেছে এবং যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন দ্বারা জাতিবিশেষ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর হইতেছে, সে যুগে আমরা ভারতবাসী এত পতিত কেন? আমরা কি মূর্খ? কি করিয়া বলিব আমরা মূর্খ, বেদবেদান্ত উপনিষদাদির অধিকারী আমরা, মানবের শ্রেষ্ঠজ্ঞান অধ্যাত্ম-চিন্তায় আমরা এখনও সর্ব্বশ্রেষ্ঠই হইয়া আছি। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ পৃথিবীর সকল চিকিৎসা-শাস্ত্রের জন্মদাতা; তাহার ত্রৈধাতুক রোগজ্ঞান যে কত সূক্ষ্ম, তাহা অন্য জাতির কীটাণু বীজাণু-ঘটিত রোগজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা এখনও সকলে স্বীকার করেন। স্বাস্থ্যরক্ষার সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রই যখন আমাদের অধিকারে আছে, তখন আমরা কিসে মূর্খ? শিল্পশাস্ত্র আমাদের দেশের ন্যায় কোথায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও কোন দেশের ইতিহাস বলিয়া দিতে পারে না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যে আবরোঁয়া বস্ত্রের সূত্র এদেশে নির্ম্মিত হইত, তেমন সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুতের কথা এখন কোনও দেশে কল্পনাও করিতে পারে নাই। ধীমান্ বীতপালের ভাস্করশিল্প যে গ্রীক্-ভাস্কর্য্যের অপেক্ষাও ভাববিকাশে শ্রেষ্ঠ, তাহা এখন সুনিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার যে দিকেই দেখ, আমাদের মূর্খতা পাইবে

না ;—তবে আমরা এতটা পতিত কেন ?—ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম, যে ঋষি ঠাকুরদের কৃপায় আমরা এখনও সকল দিকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া বসিয়া আছি, সেই ঋষি ঠাকুরদের অপরিণামদর্শিতার জন্যই কালাকালের উপযুক্ত উপদেশ দিবার ক্ষমতার অভাবেই আমরা এই অধঃপতিত দশায় উপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতেরা বলিবেন, তাঁহারা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, তাঁহারা তপস্যালব্ধ জ্ঞানে সার সত্যেরই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।—পণ্ডিতগণের, তথা শাস্ত্রের, এই কথা শিরোধার্য্য করিয়া আমিও বলিতেছি—তা ঠিক, তাঁহারা ত্রিকালদর্শীই ছিলেন,—চতুষ্কালদর্শী ছিলেন না,—তাঁহারা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ব্যাপারই দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন। এই সর্ব্ববিধ উন্নতির যুগ কলিকালের সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই দেখিতে পান নাই, তাহার উন্নতি-বিধায়ক স্পষ্ট কোন নিয়ম করিতে পারেন নাই, বা অন্য কিছুই ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাঁহারা তাঁহাদিগকে ত্রিকালদর্শী অর্থে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানদর্শী বলিয়া তাঁহাদের শক্তির ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভুল করেন। বর্ত্তমান বলিয়া কোন কালচ্ছেদ করা যায় না। তাহা অবাঙ্-মনসোগোচর ব্রহ্মের ধ্যানধারণার অতীত। কাল সম্বন্ধে যাহাই ধারণা করিবে, তাহাই হয় অতীতের, নয় ভবিষ্যতের বিষয়। বর্ত্তমান বলিয়া নিমেষ কলা কাষ্ঠা কোন নাম দিয়া কালের এক অণু-পরমাণুকেও যখন ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না, তখন বর্ত্তমান কাহাকে বলিব? ঋষিরাও বর্ত্তমান কালের কোন কথা কোথাও বলেন নাই। ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে যে সকল কথা, যে সকল বিধি-ব্যবস্থা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অতীত-চিন্তার ফলমাত্র। অতীতকে স্মরণ করিয়া

ভবিষ্যতের ছবি আঁকিতে গিয়া, তাহার জন্য বিধি-নিষেধ নির্দ্দেশ করায় তাঁহারা যে ভুল করিয়া গিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিতে গিয়া আজ আমরা এই সর্ব্বনাশের সমুদ্রগর্ভে আসিয়া পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি! অন্যদেশের বিজ্ঞব্যক্তিরা এরূপ ভবিষ্যদ্দর্শনের স্পর্দ্ধা রাখেন নাই; তাই তাঁহারা আমাদের ঋষি ঠাকুরদের ন্যায় সর্ব্ব-উন্নতির মূল স্বার্থকে ততটা তুচ্ছীকৃত করিয়া যান নাই। এই কলিকালে আত্মমর্য্যাদা, আত্মসম্মান ও আত্মগৌরব প্রভৃতি অহমত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠবৃত্তিগুলির অনুশীলনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, শ্রেষ্ঠত্বের লাভ হইতে পারে। অন্যদেশের বিজ্ঞব্যক্তিরা এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন, তাহা প্রতিদিন এ সংসারে সারসত্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হইতেছে। অন্যদেশের চেষ্টা-পরায়ণ উন্নতিকামী জাতিসমুদায় ঐ সকল অহমত্বপূর্ণ জ্ঞানের অনুশীলনে এবং স্বার্থের প্রতি ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই এ যুগে যে শ্রেষ্ঠ-পদবী লাভ করিয়াছে, আর তাহা না করিয়া পুরাতন-প্রথায় চলিতে গিয়া, সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবান্ হইয়াও ভারতবাসী যে কতদূরে, কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহা ত আর হাতের শাঁখা আলো দিয়া দেখিতে হইবে না। আমাদের ঋষি ঠাকুরেরা কেবল উপদেশ দিয়াছেন, "অহঙ্কার ত্যাগ কর, স্বার্থ ত্যাগ কর।" তাহার ফলে আমরা যুগের পর যুগ কেবল অধঃপতিত হইয়াই আসিতেছি। যাঁহারা বলেন, কেবল পরা-ধীনতাই আমাদের এ অধঃপতনের কারণ, তাঁহারাও বিষম ভুল করিয়া থাকেন। তাঁহারাও দেশের ভূত-কথা—অতীতাবস্থা স্মরণ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কথা কহেন না। যখন আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলাম, যখন স্বাধীনতার পূর্ণমূর্ত্তি এদেশে সর্ব্বত্র বিশিষ্ট-আকারে বিরাজ করিত,

অর্থাৎ যখন বিশাল ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন-রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এমন কি নগর, গ্রাম, পল্লী পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল, আরও ছোট করিয়া ধরিলে প্রত্যেকের গোত্র (গোচারণ-ভূমি) পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ এখনকার সভা-সমাজের একান্ত অভীপ্সিত স্বায়ত্ত-শাসনের পরা কাষ্ঠা ছিল,—তখনকার সেই সত্যযুগের কাল হইতে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী শক, হূণ, যবন-আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত যতদিন আমাদের হিন্দুশাসন অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেও আমরা ক্রমোন্নতির পথ না ধরিয়া, ঋষি ঠাকুরদের ঐ সকল উপদেশের অনুসরণ দ্বারা কেবল অবনতির পথেই নামিয়া আসিয়াছি। কেবল কি আমরা নামিয়া আসিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছি না কি? সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু, শিব, ভগবতী প্রভৃতি দেব-দেবীকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছি। তাঁহাদেরও ধর্ম্মের গ্লানি ও পৃথিবীর ভারহরণার্থ অবতার হইয়া কত কাণ্ডকারখানা করিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া তুলিয়াছি। ঋষি ঠাকুরদের ঐ অহমত্ব-বর্জ্জনের, স্বার্থ-ত্যাগের উপদেশগুলির অনুসরণে আমরা ক্রমশঃ সত্যযুগের ধর্ম্মের চতুষ্পাদ হারাইয়া, ত্রেতায় ধর্ম্মের ত্রিপাদ, দ্বাপরে ধর্ম্মের দ্বিপাদ এবং এই কলিতে ধর্ম্মের একপাদ মাত্র অবশেষ করিয়া তুলিয়াছি। আর অন্য দিকের কথা কি? যে ধর্ম্মের নামে আমরা দোহাই দিই, ঋষি ঠাকুরদের উপদেশে সেই ধর্ম্মেরই মাথা এমনি করিয়া খাইয়া বসিয়াছি। অবতারেরাও আসিয়া আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। ঋষি ঠাকুরদের উপদেশ অবহেলা করিয়াই যে আমরা এমন অধঃপাতে গিয়াছি, তাহা বলিবার কোনও কারণ নাই। তাঁহারাই তথা-কথিত যুগধর্ম্মের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ, অর্থাৎ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, অবতারগণের চেষ্টা সত্ত্বেও, তাহার কিছুরই যখন

পরিবর্ত্তন হয় নাই, তখন ঋষি ঠাকুরদের উপদেশ আমরা মানি নাই বলা যায় না ; বরং কড়ায়-ক্রান্তিতে পালনই করিয়াছি, দৃঢ়রূপে বলিতে পারা যায় ; নতুবা তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলা সফল হইত না। এই কলিকালের লক্ষণও তাঁহারা যাহা হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে, ইহাই ত তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আমরা যদি ঋষি ঠাকুরদের নির্দ্দেশিত পথে না হাঁটিতাম, তবে কি এমনটা হইতে পারিত ? কলির ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যাবর্জ্জিত হইবে, ইহা ঋষি ঠাকুরদের একটি ব্যবস্থা। এই কথাটাও বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। সেই কাশ্মীরের উপাধ্যায়, মিশির হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুস্থানের পাঁড়ে, দোবে, চৌবে, ত্রিপাঠী, তেওয়ারীদের লইয়া মিথিলার শাস্ত্রী, বাঙ্গালার চাটুয্যে, মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যে, সান্যাল, মৈত্র, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য ; উড়িষ্যার শাস্ত্রী, ওঝা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের পঞ্চগৌড়ান্তর্গত এবং দাক্ষিণাত্যের পঞ্চদ্রাবিড়ের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই যে আজকালকার দিনে ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জন করিয়া সময়ের কতকটা অপব্যবহার বাঁচাইয়া বিষয়চিন্তায় লাগাইয়াছে, তাহা ত আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না ; প্রত্যেকেই স্ব স্ব গৃহপার্শ্বে খুঁজিলেই দেখিতে পাইবেন। এইরূপ কত আছে। ঋষি ঠাকুরেরা উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া এবং এদেশের আপামর সাধারণের হাড়ে হাড়ে গাঁথিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, বিলাসকে ব্যসন মনে করিয়া, আহার-বিহারের সুখকে তুচ্ছ করিবে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, দগ্ধোদর কচু-ঘেঁচু দিয়া ভরাইতে হইতেছে, ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ প্রভৃতির ভেজাল নিবারণ করিবার কোন চেষ্টাও করি না। তবে তাঁহাদের কথা এই যে, দগ্ধোদর ভরাইবার জন্য ঘৃত-তৈলাদি যে একান্ত

আবশ্যক, তাহা নহে ; সুতরাং ঘৃত তৈল যখন অপবিত্র হইতেছে, তখন উহা খাইব না, অলবণ হবিষ্য ত কেহ ঘুচাইবে না ; বরং ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদিত সেই সাত্ত্বিক আহারে দিন দিন মনুষ্যের পরম শত্রু রজঃ ও তমোগুণ ক্ষয়িত হইতে থাকিবে। দেশের অন্ন বিদেশে বাহির হইয়া যাইতেছে বলিয়া, ভবিষ্যতে দেশে তণ্ডুলাভাব হইলেই বা ক্ষতি কি ? ঋষি ঠাকুরদের উপদেশে আমরা শিখিয়াছি, ক্রমশঃ ফলাহার, বাতাহার, উপবাস এবং সর্ব্বশেষ প্রায়োপবেশনে তপস্যায় বসিয়া গেলে শ্রীহরির সাক্ষাৎ যখন পাওয়া যাইবে, তখন চমৎকার অন্নচিন্তায় সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক কি ? শ্রীহরি-দর্শনলাভের অপেক্ষা পুরুষার্থ আর কি আছে ? প্রার্থনীয়ই বা কি হইতে পারে ? এতটা যখন সুবিধা ঋষি ঠাকুরদের ব্যবস্থায় আমাদের হইতে পারে, তখন আবার আমরা পতিত বলিয়া চিন্তিত হই কেন ? চিন্তিত হইবার কারণ আছে বৈ কি ! চারি যুগ ধরিয়া ঋষি ঠাকুরদের উপদেশ অনুসরণ করিয়া আমরা পতনের অভিজ্ঞতাই লাভ করিলাম, উন্নতির বাষ্পও ত দেখিলাম না। একদিন আমরা বেদ-বেদান্ত, আয়ুর্ব্বেদ-গণিত লইয়া জগতের শিক্ষকপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম ; আর আজ অন্যদেশের এমন সকল জাতি আসিয়া আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করিতেছে যে, যাহারা দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বন্যপশুর ন্যায় বন-জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, সিদ্ধান্ন, বস্ত্র বা গৃহের পরিচয়ও জানিত না। ইহা কি আমাদের অধঃপতন নহে ? তবে একটা আশার কথা আছে, সেটা ম্লেচ্ছাচার ও একাকার। এটাও সেই ঋষি ঠাকুরদের ব্যবস্থার মধ্যেই দেখা যায়। এইটাই আমাদের এখন ভরসাস্থল। এই দু'টা অবলম্বন করিতে পারিলেই আমাদের মুক্তি,

আমাদের উন্নতি, আমাদের চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধ হইবে। কেন না, দেখিতে পাইতেছি, এ যুগে যে কোন জাতি উন্নতি করিয়াছে, করিতেছে বা করিবে বলিয়া লক্ষণ দেখাইতেছে, তাহারাই আমাদের ঋষি ঠাকুরদের কথিত ম্লেছাচার ও একাকার অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। কথাটা খুব সত্য ; কারণ, বাঙ্গালা-সাহিত্যের ঋষি বঙ্কিম তাঁহার আনন্দ-মঠ নামক পুরাণে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "যদি সত্যে কার্য্য না হয়, তবে মিথ্যায় হইবে ?" অথচ তিনি আনন্দ-মঠের সন্তান-সেনা-গঠনে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, আচারভেদ নিরাকৃত করিয়া সব একাকার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যদি একাকারে সত্য না থাকিত, উন্নতিলাভ না ঘটিত, শ্রেয়োলাভ না হইত, তবে এ যুগের সাহিত্যিক-ঋষি বঙ্কিম এমনটা করিতেন না। যদি এক ভারতবর্ষ ব্যতীত খোদার দুনিয়ায় তামাম রাজ্যে এই (ম্লেচ্ছাচার ও একাকার) দু'টা অবলম্বনে উন্নতিলাভ করিতে পারে, তবে আমরা ত আর ভগবানের ত্যজ্যপুত্র নহি যে, আমরা উহা দ্বারা উন্নতিলাভ করিতে পারিব না। আর সদয়হৃদয় ঋষি ঠাকুররা আমাদের জন্যও কলিকালে সেই একাকার ও ম্লেচ্ছাচারের ব্যবস্থা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন এবং ইঙ্গিতে আমাদের তদবলম্বনেই উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। এ সময়ে যাঁহারা কৃতবিদ্য, মনস্বী, লোকহিত তথা দেশহিতে ব্রতী, তাঁহারাও ভাবিয়া চিন্তিয়া উহাই উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা স্থির করিয়াছেন। সুখের বিষয়, আজকাল দেশেও তাহার বহুবিধ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। ফলও ফলিতেছে। তবে এখনও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে না। তাহাও সেই ঋষি ঠাকুরদের দোষে, উপদেশের কার্পণ্যে। তাঁহারা বলিয়াছেন, এ দেশে ম্লেচ্ছাচার ও

একাকারের পূর্ণমাত্রা ঘটিবে অন্তিম কলিতে। সেই অন্তিম কলিও তাঁহাদের হিসাবে উপস্থিত হইতে এখনও লক্ষ লক্ষ বৎসর বাকী আছে। তাঁহাদের হিসাবে কলির পূর্ব্বসন্ধ্যা (অর্থাৎ দ্বাপর ও কলির মধ্যবর্ত্তী দ্বিভাবাত্মক কাল—transitory period) অতীত হইতেই ৬ হাজার বছর লাগিবে,—তাহাই এখনও শেষ হয় নাই; সুতরাং এখনও এ দেশের অনেকে ঋষি ঠাকুরদের সেই অহমত্ববর্জ্জিত, আত্মসম্ভ্রমজ্ঞানহীন, স্বার্থজ্ঞানশূন্য শিক্ষারই অনুবর্ত্তন করিতেছেন! তবে শুভসূচনা হইয়াছে। ম্লেচ্ছাচারও দেখা দিয়াছে, আর একাকারও হইতেছে। এখনকার পণ্ডিতেরা মনে করেন, ম্লেচ্ছাচার পূর্ণ হইলে উচ্চবর্ণ শূদ্রাচার অবলম্বন করিবে এবং বর্ণাশ্রমাচার তুলিয়া দিয়া একাকার করিয়া ফেলিবে। কেবল শূদ্রাচার থাকিবে কিরূপে? উচ্চবর্ণ না থাকিলে শূদ্রাচারের কোন অর্থ থাকে না। একাকার অর্থে সকলের শূদ্রত্বগ্রহণও নহে। ও সকল নাম মনে করিলে বা থাকিলে কিছু হইবে না, সেই পুরাতন গণ্ডীর ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়াই বেড়াইতে হইবে। অতএব আমি যে শুভ-লক্ষণের সূত্রপাত দেখিতেছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমরা (ঋষি ঠাকুরদের উপদেশমত) যাহাদিগকে এখন ম্লেচ্ছ বলি, আচারে-ব্যবহারে এবং প্রাণে-প্রাণে ঠিক তাহাদের মত হইবার জন্য আমরা দিন দিন তাহাদের আহার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, বিদ্যা-বুদ্ধি —সমস্ত বিষয়ের অনুকরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি এবং কতক কতক (দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে তাহা এখনও নগণ্য সংখ্যা হইলেও তাহার) ফল হইয়াছে, দেখিতেছি। আমারা এই চারি যুগ চেষ্টা করিয়া ঋষির উপদেশে চলিয়াও ঋষির আদর্শ লাভ করিতে পারি নাই; বরং সে

আদর্শ হইতে দূরে পড়িতেছি; কিন্তু অল্প দিনের অনুকরণে যে নবীনাদর্শের, উন্নতিকর আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে যাইতেছি, ইহাতে আশার সঞ্চার হয় না কি? এখনকার উন্নত জাতির বিদ্যা ও শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে আমাদের এই উন্নতমুখী গতি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও সেই ঋষি ঠাকুরদের আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মানিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা কলির ব্যবস্থা এমন না করিয়া যদি অন্যবিধ করিতেন, তাহা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই অন্য পথে চলিতে বাধ্য হইতাম। ভাব দেখি, তাহা হইলে, আজ আমাদের কি সর্ব্বনাশ না হইত! একাকারেরও সূত্রপাত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন, ভারতে শ্রেষ্ঠ জাতিরা অন্ত্যজ জাতিতে নামিয়া একাকার করিবে, তাঁহারা ভুল বুঝিয়া রাখিয়াছেন। কলিকালে এক এ দেশের ঋষি-শাস্ত্র ব্যতীত অন্য দেশের শাস্ত্রে উন্নতির যুগ বলিয়া অভিহিত! ক্রমোন্নতি, অভিব্যক্তি, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন প্রভৃতি উন্নতির বহুলক্ষণ একালে সপ্রমাণ দেখা দিয়াছে। সকল জাতির মধ্যে শ্রেয়োলাভের জন্য,—উন্নতির জন্য স্পৃহা জাগিয়াছে। বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট ভারতেও তাহার ঢেউ লাগিয়াছে। বর্ণাশ্রমাচারী হিন্দুর বিবিধ বর্ণ ও উপবর্ণ এখনিই (কলিকালের অন্তিমদশা উপস্থিত না হইলেও, এখনিই) ঋষি ঠাকুরদের বর্ণ-ব্যবস্থারই দোহাই দিয়া স্ব স্ব বর্ণের উন্নতিতে মন নিবিষ্ট করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে তাহার আরও বিস্তৃতি হইয়াছে। সকলেই উচ্চবর্ণের সম্মান পাইবার আশায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। এখানকার কায়স্থেরা আপনাদের ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব প্রমাণ করিয়া আপনাদের দ্বিজাতীয়ত্বের লক্ষণ সূত্র ধারণ করিতেছে। যুগীরা যোগি-বংশাবতংস বলিয়া সূত্র ধারণ করিয়াছে। বৈদ্য ও শঙ্খবণিকের (শাঁখারীর) পৈতা

পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান আছে। এখন গন্ধবেণে, সোণার বেণে, কাঁসারী, সেকরা, কামার, তাঁতি, বারুই, ছুতার, তিলি ও তেলী (মায় কলু), গোয়ালা, নাপিত, কৈবর্ত্ত (চাষা ও জেলে), শুঁড়ী, প্রভৃতি সকলপ্রকার ব্যবসায়ী জাতি আপনাদের পূর্ব্ববৈশ্যত্বের দাবী করিয়া যদি সূত্র ধারণ করিতে পারে, তবে ভাবিয়া দেখুন, গোটা ভারতবর্ষটার গলায় দড়ি দিয়া একাকারের রাজত্ব কেমন দৃঢ়তর হইয়া যাইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অন্ন এবং কন্যাগ্রহণে তখন আর ব্রাহ্মণের মৌখিক আপত্তিও থাকিবে না। এইরূপ সকলেই উন্নতির দিক্ দিয়াই একাকার করিবে, আর সেইটাই বিজ্ঞানসম্মত। উন্নতিই এ যুগের লক্ষণ, উন্নত হওয়াই সাধনার সাফল্য, সুতরাং অবনত হইয়া শূদ্রত্ব লইয়া কেহ একাকার করিতে রাজি হইবে, এটা মনে করাই অর্ব্বাচীনতা। তারপর শূদ্রত্বের কথা। আজ-কাল উপেক্ষিত জাতির উন্নতিবিধানকল্পে উচ্চবর্গীয়েরাই আড়হাতে লাগিয়া গিয়াছেন। চামার, চণ্ডাল, ধোপা, হাড়ী, মেথর ইত্যাদি খাঁটি শূদ্রেরা যদি ইঁহাদের চেষ্টায় ম্লেচ্ছাচার ও একাকারের প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়া একবার আধুনিক বিদ্যামন্দিরের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে, তবে সূত্রধারী বৈশ্য-পদবী লাভের পরদিন আর কেহই তাহাদের বাধা দিতে পারিবে না; বিশেষতঃ ইহারা যেরূপ অধ্যবসায়-শীল, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী বলিয়া এখনও পরিচয় দিতেছে, এই অন্ন-বিভ্রাটের দিনে আপনাদের বৃত্তি-বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিরুপদ্রবে স্ত্রীর হাতে রূপার পৈঁছা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে, তাহাতে ইহারা আধুনিক উন্নতিকর বিদ্যালাভ করিতে পারিলে, আর ইহাদের জন্য ভাবিতে হইবে না। ইহারা তখন তর্ তর্ করিয়া উন্নতির সোপান

কয়টা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে থাকিবে। এইরূপে একদিন এতকালের শূদ্রবর্ণ উন্নত হইয়া দ্বিজবর্ণে মিশিয়া যাইবে। তাহার পর কথা হইবে,—"সবাই যদি হবে দে (দেব) এটোঁ পাত কুড়াবে কে?"—যদি সবাই শিখা-সূত্রধারী হইয়া বিদ্যালাভ করিয়া একাকারের রাজত্বে সমানাসনে আসীন হয়, তবে ইহাদের ব্যবসায়গুলা চালাইবে কে? কর্ম্মগুলা নির্ব্বাহ করিবে কে? আমাদের ভারতবর্ষে লোকের অভাব নাই। সভ্যতাভিমানী জাতিরা এদেশে আসিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া ইহার মধ্যেই তাহাদের দ্বারা ড্রেণ পরিষ্কার করাইয়া লইতেছেন। এই দল অর্থাৎ ভারতের এই বন্য অসভ্য জাতিরা ভবিষ্যতের উন্নতিশীল উচ্চবর্ণের সংশ্রবে পড়িয়া তাহাদের প্রয়োজন সাধনার্থ নূতন দাস বা শূদ্রবর্ণের স্থান পূর্ণ করিবে। এই মীমাংসায়, ভারতের এই ভবিষ্যৎ-মঙ্গলময় ছবির কল্পনায় মন বড় খুসী হইল। তবে কেবল মনে পড়িল যে, এই উন্নতির যুগে এদেশের ব্রাহ্মণেরা এমন নিশ্চল বসিয়া কেন? তাহারা কোন উন্নতির চেষ্টা করিতেছে না কেন?—তখনই মনে হইল,—তাহারা আর কি উন্নতি চাহিবে?—সকল উন্নতিই তাহাদের জন্য সমাজে, দেশে, দেশের বাহিরে বর্ত্তমান। বর্ণগুরুরূপে তাহারা সমগ্র ভারতবাসীর সম্মানভাজন; উপনিষদাদি জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া তাহারা সমস্ত পৃথিবীর সম্মানভাজন; তাহাদের আহার-বিহার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমস্ত দেশটা খাটিতেছে; গাভীর নূতন দুগ্ধ, চাষের নূতন ফসল, গাছের প্রথম ফল ব্রাহ্মণকে না দিয়া এখনও কেহ খায় না। পিতৃকৃত্যে, ব্রত-পূজায়, দানধর্ম্মে ব্রাহ্মণের প্রাপ্তি সর্ব্বাগ্রে; তদ্ভিন্ন সমস্ত দেশের লোকের মুক্তির ভাণ্ডারের চাবি তাহাদের হাতে; অতএব তাহারা

—রোগশয্যার প্রলাপ—

আর কেন উন্নতির লালসায় কিছু করিতে যাইবে ?—অনেক ভাবিলাম ; কিন্তু দেখিলাম যে, সত্যসত্যই তাহারা নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। সমস্ত পৃথিবীটাই যখন এ যুগে উন্নতির গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণেরাই যে কেবল নিশ্চেষ্ট থাকিবে, তাহার আর সম্ভাবনা কোথায় ? কালস্রোতে বাধা তাহারা দিতে পারে, এমন সাধ্য তাহাদের নাই ; পূর্ব্বেও কোন দিন তাহার চেষ্টাও করে নাই, আর এখনও করিতেছে না। তাহারাও উন্নতি-স্রোতে পড়িয়া অপর সকলের সহিত মিলিয়া চলিয়া যাইতেছে। তবে তাহাদের গতিটা দেখিতে আপাততঃ বিপরীত-মুখে হইতেছে, কেন না তাহাদের উন্নতি স্বার্থের দিক্ হইতে যখন অবশিষ্ট কিছু নাই, দুনিয়ার যাহা কিছুই প্রার্থনীয়, তাহা সমস্তই যখন তাহাদের আছে, তখন তাহাদের গতি অন্যদিকেই দেখা যাইবে না ত কি হইবে ? তাহারা শিখা-সূত্র, সন্ধ্যা-আহ্নিক, অধ্যাপন-অধ্যয়ন, যজন-যাজন ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়া দেশের বিরাট্ লোকসঙ্ঘে মিশিয়া যাইতেছে। ঋষি ঠাকুরদের নির্দ্দিষ্ট কলির ব্রাহ্মণের লক্ষণগুলা তাহারা দিন দিন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে এ যুগের ব্যবস্থামত স্পৃহণীয় উন্নতির চরমসীমায় ভারতবাসী যখন পৌঁছিবে, তখন আবার সত্যযুগ আসিবে, তখন আবার নবীন সমাজ গড়িবার জন্য গোড়ায় দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় সভ্যতার ও অসভ্যতার যুদ্ধ বাধিবে ; আর সেই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় অসভ্য বন্যজাতি হইতে আবার শূদ্রবর্ণের ন্যায় দাসবর্ণ গঠিত হইতে থাকিবে। ভাবিতে ভাবিতে এইরূপে সেই ঋষি-কল্পিত বর্ত্তমান শ্বেতবরাহকল্পের অন্তর্গত বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি মহাযুগের কলিযুগ অতিক্রম করিয়া অষ্টাবিংশতি মহাযুগের

—রোগশয্যার প্রলাপ—

আরম্ভে সত্যযুগের দ্বারে গিয়া উঠিলাম।—আনন্দে মাথাটা ঘুরিয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "আজকার প্রলাপটায় বড় বেশী রক্ত মাথায় উঠিয়া গিয়াছে। একটু বেদানার রস খাইয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়ুন।" আমিও সম্মত হইয়া বলিলাম,—'তথাস্তু'।

১৫

একদিন মনে হইল,—বিদেশ হইতে যাঁহারা আইন ও চিকিৎসা শিখিয়া আসেন, এখনও দেশে তাঁহাদের উপার্জ্জন ও বিদ্যা-প্রচারের অবসর ও স্থান আছে, কিন্তু যাঁহারা কৃষি বা অন্যান্য ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কি সুবিধা হইতে পারে? দেশের সমস্ত ব্যবসায় পরহস্তগত, তাহারা স্বজাতিপ্রতিপালক, এদেশীয় শিক্ষিত লোককে অল্পবেতনে পাইবার সুযোগ থাকিলেও কেবল স্বজাতি-বাৎসল্যের বশে তাহারা ব্যবসায়ীর উপযুক্ত ব্যয়হ্রাস-নীতিও পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতীয় ব্যক্তিকেই অধিক বেতনে নিযুক্ত করিয়া থাকে। দেশের লোকের এমন কোন কারবার বা এমন কোন কারখানা নাই যে, সেখানে এই সকল শিক্ষিত দেশীয় যুবকবৃন্দের অন্নসংস্থান হয় বা ইঁহারা শিক্ষালব্ধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন। এখন এই সকল যুবককে প্রতিপালন করিতে হইলে, দেশের লোকের কল-কারখানা কি বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, নতুবা এই শিক্ষিত-সম্প্রদায় দেশের পক্ষে 'ভার-বোঝা' হইয়া উঠিবেন; কিন্তু দেশের লোকের সেরূপ উপায় কিছু অবলম্বনের শক্তি আছে কি না, তাহাও ভাবিবার বা পরামর্শের বিষয়।

ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম,—দেশের অবস্থা এ বিষয়ে বড়ই সঙ্কীর্ণ। যাঁহারা কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিতেছেন, জমীদারশ্রেণী মনে করিলে,

ইঁহাদের প্রতিপালন করিতে পারেন। জমীই যখন জমীদারের এবং প্রজার সর্ব্বস্ব, তখন জমীর উর্ব্বরতা, ফসলের নবীনতা ও পুষ্টি সাধনার্থ এই সকল যুবকের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। দেবমাতৃক দেশে অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির প্রতিবিধান করিয়া রাখা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; তাহাও এই সকল যুবকের সাহায্যেই সম্পন্ন হইতে পারে। নদীমাতৃক দেশে বন্যা-নিবারণ, লোণা জলের প্রবেশ-রোধ, খাল কাটিয়া বড় নদী বা বিলের জলনিকাশের বা সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইলেও এইসকল যুবকের সাহায্যই প্রার্থনীয়। জমীর উর্ব্বরতা বর্দ্ধন, জমীতে একাধিক ফসল উৎপাদন, ফসলের পুষ্টিসাধন, অল্প ব্যয়—অল্প পরিশ্রমে বহুশস্য উৎপাদন এবং নূতন নূতন আয়কর ফসলের উৎপাদন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইলেও এই যুবকগণের সাহায্য আবশ্যক। জমীদারেরা এখন কেবল খাজানা আদায়ের জন্য নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মোহারের, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদি নিযুক্ত করেন, প্রজাপালনের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন না। অবশ্য অনেক জমীদার যে গ্রামে গ্রামে ইস্কুল ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রজার হিতার্থই করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রজাপালনের বহু সদুপায়ের মধ্যে এই দুইটি প্রকৃষ্ট উপায় হইলেও পর্য্যাপ্ত নহে। প্রজার অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন জমীদারেরও আয় বর্দ্ধিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তখন প্রজার অবস্থার উন্নতি-সাধনার্থ জমীদারের এই কৃষির উন্নতি-সাধনে সাহায্য করা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত। এজন্য আজকালকার দিনে প্রতি নায়েবের বা গোমস্তার কাছারীতে তদধীন সমস্ত গ্রামের

প্রজাকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য এক একজন কৃষিবিদ্যাপারদর্শী যুবককে নিযুক্ত করা উচিত। সেকালের জমীদারেরা পূর্ত্তকার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয় করিতেন। এখন দেশের রাজা সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা এখন পথকর গ্রহণ করিয়া সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সুতরাং সে দিকে এখন জমীদারের দৃষ্টি না দিলেও চলে। রাজা পথকরের টাকা কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, না করিতেছেন, তাহা রাজ্যের হিতৈষী মন্ত্রি-বর্গের পরামর্শদাতৃবর্গের দর্শনীয়। প্রতি বৎসর প্রত্যেক জমীদার যে পরিমাণ টাকা পথকর দেন, প্রতি বৎসর তাঁহার জমীদারীতে পূর্ত্তকার্য্যে সে পরিমাণ টাকা রাজ-ব্যবস্থায় খরচ হয় কি না, জমীদারেরা তাহা রাজ্যপালনকর্ত্তৃগণকে জিজ্ঞাসা করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী বলিয়া মনে করিলে কোন প্রত্যবায় হয় না। সুতরাং জমীদারেরা স্বীয় স্বীয় জমীদারীতে পূর্ত্তকার্য্যের জন্য রাজার সহিত বুঝাপড়া করিয়া, যে কার্য্য নিজেরা না করিলে চলিবে না, সেই কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য যদি কিছু খরচপত্র করেন, তবে প্রজারক্ষা দ্বারা আত্মরক্ষাও হয়।

তারপর যে সকল যুবক চিনি, সাবান, দেশালাই, কাচ, লৌহ, খনি প্রভৃতির কাজ শিখিয়া আসেন, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র দেশে এখন নাই। কে যে করিয়া দিবেন, তাহাও জানি না, আমাদের দেশে বিদেশের ধনার্জ্জনকারী স্বদেশী বণিক্-সম্প্রদায় নাই, ইচ্ছা করিলেই, দেশ-ব্যবস্থায় তাহা এখনই জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশীয় ব্যবসাদার যাঁহারা আছেন, তাঁহারা বড় বড় দোকানদার, আড়তদার মাত্র। বিদেশী মালের আমদানি করিবার স্বাধীনতা তাঁহাদের আছে, কিন্তু

স্বদেশী মালের রপ্তানিতে তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই, সুতরাং ঘরের টাকা দিয়া পরের লাভ ঘটাইতে তাঁহারা পারেন ; কিন্তু ঘরের মাল বেচিয়া বিদেশের টাকা ঘরে আনিতে তাঁহারা পারেন না। অবশ্য দেশের মাল বিদেশী বণিকের গোমস্তাকে বিক্রয় করিয়া তাঁহারা বিদেশীর অর্থ একবারেই যে কিছু পান না, তাহা নহে, তবে দেশের দ্রব্য বিদেশে নিজে লইয়া গিয়া বিদেশীয় প্রয়োজনমত চড়া দরে বিক্রয় করিয়া যে বিপুল অর্থ লাভ করা যায়, সে লাভ তাঁহাদের হয় না ; কাজেই ঠিক বিদেশের অর্থ এদেশে আসে না। অতএব বাণিজ্য-ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ ঐ সকল বিদ্যায় শিক্ষিত যুবকগণের কার্য্যক্ষেত্র এখন দেশে বর্ত্তমান নাই, সুতরাং উঁহাদের ভবিষ্যৎ বড় গণ্ডগোলে পড়িয়া আছে। আরও একটা দিক্ ভাবিবার আছে।—এই সকল বিদ্যা যাঁহারা শিখিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যে দেশে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন, সে দেশের বর্ত্তমান উন্নত-অবস্থা-সুলভ অতি উন্নতপ্রণালীর বহুব্যয়সাধ্য যন্ত্রাদির সাহায্যমূলক কার্য্য-প্রণালীই শিখিয়া আসিতেছেন। তত অর্থব্যয় করিয়া সেরূপ যন্ত্র এদেশে কেহ আনাইতে পারেন না, কাজেই বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াও ঐ সকল যুবকেরা উপযুক্ত কল-কারখানার অভাবে ঠুঁটা জগন্নাথ হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হন।

এইখানে যৌথ-কারবারের কথা মনে আসিল। এখানে যদি একা দ্বারা বহুমূল্য কল-কারখানা করা সম্ভব না হয়, তবে যৌথ-মূল-ধনে তাহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এদেশে এরূপ যৌথ-কারবারের অভিজ্ঞতা নাই, এরূপ কারবার পরিচালনের শক্তিও এদেশে নাই। সত্য বটে, মাড়বারী দোকানদারের ও পূর্ব্ববঙ্গের মহাজনী কারবারে আমরা

দুই তিন জন ধনীর নাম একত্র গ্রথিত দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ঐ দোকানের এবং আড়তদারীর কারবারে। কল-কারখানার কারবারে অভিজ্ঞতা কাহারও নাই। যৌথ-কারবারের চেষ্টা আমাদের দেশে যে হয় না, এমন নহে, কিন্তু যাঁহারা তাহার পরিচালক হইয়া বসেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও অভিজ্ঞতা আইনে, কাহারও অভিজ্ঞতা জমীদারী পরিচালনে, কাহারও অভিজ্ঞতা দোকানদারীতে, কাহারও অভিজ্ঞতা তেজারতীতে। আসল কাজে অভিজ্ঞতা কাহারও থাকে না বলিয়া, আমাদের দেশে এ সকলের যৌথ-কারবার স্থায়ী হইতে পারিতেছে না।

আমার মনে হয়, আজ-কাল যেমন কল-কারখানায় কার্য্য (Mechanical Engineering) শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে, তেমনি কল-কারখানার ব্যবসায় চালাইবার কার্য্য-প্রণালী শিখাইবার চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে না করাটা ভুল হইতেছে। বিজ্ঞান-শিক্ষার সাহায্য করিবার জন্য যে সমিতি খরচপত্র দিয়া এদেশের যুবকদের বিদেশে পাঠাইতেছেন, তাঁহারা যে যাহা শিখিতে চাহিতেছে, তাহাই শিখিবার জন্য পাঠাইতেছেন। এরূপ ব্যবস্থায় একটু বিশৃঙ্খলা আছে বলিয়া বুঝিতেছি। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইব,—একজন যুবক চিনির কাজ শিখিতে গেলেন, তিনি চিনির কৃষিমাত্র শিখিয়াই আসিলেন, সুতরাং যে চিনির কারবার চালাইবে, সে তাঁহার একার সাহায্যে কি করিবে? চিনির কল চালাইবার অভিজ্ঞ লোক একজন চাই। চিনির কাটতি কিসে হইবে, চিনির কারখানার লোকজন কেমন করিয়া খাটাইবে, চিনির কারখানার আয়-ব্যয়ের হিসাব কেমন করিয়া রাখিবে, চিনির চাষের সহিত কারখানার কিরূপ সম্বন্ধ রাখিলে সুবিধা হইবে—ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ

লোকেরও প্রয়োজন, অতএব চিনির কৃষি-শিক্ষার্থী যুবকের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভের জন্য বিভিন্ন যুবককে শিক্ষার্থিস্বরূপ পাঠান আবশ্যক। এক একটা কারবারের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষায় শিক্ষিত এক এক সেট্ লোক একসঙ্গে প্রস্তুত করিয়া না আনিলে কি হইবে?

আরও এক কথা। উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরূঢ় দেশের কারবারের প্রণালী উন্নতির পথে নবীন যাত্রী দেশের পক্ষে কখনই সুপ্রযুক্ত হইতে পারে না। কথার বলে, "হেলে ধরিতে পারে না, কেউটে ধরিতে যায়"—সুতরাং এদেশের পক্ষে সকলপ্রকার ব্যবসায়ের ও কারখানা পরিচালনের উন্নত-প্রণালীই একবারে চালাইতে চেষ্টা করা অপেক্ষা, উহাদের প্রাথমিক পরিচালন-প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, আর তাহাই শিক্ষা করিয়া আসা উচিত।—তাহা না হইলে, উন্নত-প্রণালীর কারখানা বা ব্যবসায় চালাইবার বিপুল আয়োজনের বিপুল ব্যয়ভার সঙ্কুলান করা এদেশের অশিক্ষিত আরম্ভকারীদের পক্ষে যেমন কঠিন হইয়া পড়ে, তেমনি তাহাই আবার অতি অল্পেই তাঁহাদের অবসন্ন করিয়া ফেলে। এরূপ নিষ্ফলতা বা বিফলতার দৃষ্টান্ত দেশে যথেষ্ট বর্ত্তমান। "ছিল না লক্ষ্মীপুজো, একেবারে দশভুজো"—করিতে গেলে চলিবে কেন? এ বিষয়ে আমাদের বর্ণপরিচয় হইতে শিখিয়া আসিতে হইবে এবং বর্ণপরিচয় হইতেই শিখাইতে হইবে। ক্ষুধা বেশী বলিয়া ছালসমেত নারিকেল কামড়াইলে দাঁতই ভাঙ্গিয়া যাইবে, পেট ভরিবে না। কেবল যুবকদের শিক্ষিত করিয়া আনিলেই এখন চলিবে না। সেই শিক্ষিত যুবকদের যাঁহারা প্রতিপালন করিতে পারিবেন, যাঁহারা তাঁহাদের

সাহায্যে কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিবেন, সে সকল লোককেও শিক্ষা দিয়া শিক্ষিত যুবকগণের কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা না পারিলে ঐ শিক্ষিত যুবকদেরই অধিক ক্ষতি করা হইবে।

এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় শ্রদ্ধাভাজন কৃষিবিদ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। তাঁহাকে দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ ছেলে পড়াইয়া যাইতে হইতেছে। তাহাও কি, তিনি যে বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন, সেই বিদ্যায় ছাত্রদের পণ্ডিত করিতে পারিতেছেন! তাহা নহে। গতানুগতিক প্রথায় বঙ্গবাসী কলেজ করিয়া তাঁহাকে সাহিত্যের সামান্যাংশ ও বিজ্ঞানের সামান্যাংশ পড়াইয়া দিনপাত করিতে হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে শিক্ষার্থী ও কৃতবিদ্যের শিক্ষা ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যবস্থা না করিলে, বিশেষ কোন ফল-লাভের আশা নাই। তাহার পর মনে হইল,—এত শিক্ষা দিবার লোক কৈ? তাহার উপযুক্ত লোকই বা কৈ? উপদেশ শুনিলেই বা উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে, এমন লোকই বা কৈ? যাঁহারা এ বিষয়ে খাটিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের প্রতিপালন করে কে?—কাজেই এ দিকে আর ভাবনা চলিল না।—তবে মনে হইল,—দেশের ধাতু এখন বদ্‌লাইতেছে। যে ধ্যান-ধারণায়—যে লক্ষ্যে দেশ এতদিন কাজ করিয়া আসিয়াছে, এখন অন্য দেশের ধ্যান-ধারণা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, দেশ তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে; কাজেই দেশের এখনও গতি স্থির হয় নাই। এই দোলায়মান অবস্থা হইতে দেশে কত দিনে কর্ত্তব্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল হইবে, তাহা কে জানে? শিক্ষাহীনতা, অর্থহীনতা বা জড়ত্ব যে এই শৃঙ্খলা-সাধনে একমাত্র

বাদী হইতেছে, তাহা নহে। অনুকরণ দ্বারা দেশ যাহা চাহিতেছে, তাহার উপকারিতা, কৃতকারিতা দেখিয়া বুঝিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আর দেশের যাহা আছে, যাহা হারাইয়াছে বা এখন অপরের অনুকরণ করিতে গিয়া যাহা হারাইতেছে, তাহাই তাহার নিজস্ব চিরপ্রিয়, তাহাই তাহার নিজত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং এতদিনের মান-মর্য্যাদা-রক্ষায় সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, কাজেই তাহা ছাঁড়িতেও সে কষ্ট বোধ করিতেছে, কাজেই এখনও তাহার লক্ষ্যই বিধিমত নির্দ্ধারিত হয় নাই বলিতে হইবে। এরূপ স্থলে লক্ষ্য স্থির করাও লোক-বিশেষের চেষ্টায় হয় না, কাল ইহার নিয়ামক। কালে ইহা স্থিরীকৃত হইবে। যতদিন কাল সেই কার্য্য করিয়া উঠিতে না পারিতেছে অর্থাৎ দেশটা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্ত্যরূপে গঠিত হইবে, কি ইহারা প্রাচ্যত্ব রক্ষা করিতে পারিবে, অথবা উভয়ের মিশ্রণে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে,—ইহা ঠিক করিতে না পারিতেছে, ততদিন ইহাকে এই অস্থিত-পঞ্চকের অবস্থা-সুলভ ক্ষতি বাধ্য হইয়াই সহ্য করিতে হইবে।

তবে কি ততদিন দেশ নিশ্চিন্ত থাকিবে? না, তা থাকিবে না; কালই তাহা থাকিতে দিবে না। কত শত চেষ্টায় সে সফলতা ও বিফলতার মধ্য দিয়া নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইবে। এই সফলতা ও বিফলতার জন্য যে লাভ ক্ষতি ঘটিবে, তাহাতেও এই দেশকেই সুস্থ ও উৎপীড়িত হইতে হইতে অগ্রসর করিবে। ইহার প্রতিবিধান যদি কেহ আশা করেন বা কার্য্যটা কিছু আগাইয়া আনিয়া শীঘ্র শীঘ্র শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে নিরাহারে পঞ্চতপা করিয়া ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিতে হইবে।

অতিমানুষিক শক্তি, ঐশী শক্তি ব্যতীত কাল জয় করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আবার দেখিতে গেলে তাহাও সেই কাল-সাপেক্ষ,—তপস্যায় সিদ্ধি সঙ্কল্প মাত্রই লাভ হয় না,—সাধনার পর সাধনায়, যথাকালে তাহা হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না যে, কেহ তপস্যা দ্বারা নিয়মিত কাল সংক্ষেপ করিয়া লইতে পারে। সগরবংশ উদ্ধারের উপায় গঙ্গাবতারণ জানা থাকিলেও অসমঞ্জ দীলিপাদি রাজগণ তপস্যা করিয়াও কাল সংক্ষেপ করিতে পারেন নাই,—সেই যথাকাল-নিয়মিত ভগীরথের তপস্যার পর মহাকাল সেই গঙ্গাবতারণ-তপস্যায় সিদ্ধি দান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চ-গ্রাম ভিক্ষাতেও যুধিষ্ঠিরাদির হৃতরাজ্য উদ্ধার হয় নাই,—যথাকাল-নিয়মিত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাবসানে মহাকাল সেই উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিলেন; অতএব এই মীমাংসার উপর মন আর ভাবিতে পারিল না, কাজেই পাশ ফিরিয়া শুইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলিলাম,—‘এবমস্তু।’

১৬

একদিন মনে করিলাম,—এ দেশে ৭২ কোটি লোকই হউক আর ৮২ কোটি লোকই হউক, এই দেশের উৎপন্ন শস্যেই গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া চলিত, এখন তাহা আর পারিতেছে না কেন?—ভাবিয়া দেখিলাম,—অন্নাভাবের কারণ হইয়াছে—বিদেশে শস্য রপ্তানি এবং বস্ত্রাভাবের কারণ হইয়াছে—বিদেশী বণিকের মস্তিষ্ক-প্রসূত কল-কারখানায় প্রস্তুত সুলভ ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের আমদানি; আর এই দুইয়ের উৎপাতে দেশে সুখস্বাচ্ছন্দ্য লোপ হইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতিকার কি নাই? মন আরও ভাবিতে লাগিল, এই শস্য রপ্তানিতে ত দেশের কৃষক-সম্প্রদায় অর্থশালী হইতেছে; সেই অর্থের সাহায্যে অন্ন ক্রয় করা যাইতে পারে, সুতরাং ইহাতে ক্ষতি কি?—ক্ষতি আছে। কৃষক শস্য দেশে বিক্রয় করিলে দেশের লোকও তাহাকে অর্থ দিয়া আপনাদের অন্ন ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু বিদেশে শস্য বিক্রয় করিলে বিদেশী অর্থ কেবল কৃষকের হস্তগত হয়, দেশের লোক তৎক্ষণাৎ সে অর্থ পায় না। তাহাদের নিজের অর্থ দিয়াই তখন বিদেশে অন্ন ক্রয় করিতে হয়, তাহাতে ক্রমশঃ দেশের অর্থও (দেশের শস্যের ন্যায়) বিদেশীর করগত হইয়া পড়ে এবং কালে দেশই শস্য ও অর্থ—উভয়েই বঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং দরিদ্র ও অন্নহীন হইয়া মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হইতে থাকে। আমাদের দুর্দ্দশা এইরূপেই সাধিত হইতেছে। ইহার প্রতিকার করা

অসম্ভব। বিদেশী বণিকেরা অন্ন-চেষ্টায় আসিয়া শস্যশালী ভারতীয় কৃষককে দাদন দিয়া অর্থলোভে মুগ্ধ করে। তাহারা শস্যসংগ্রহের জন্য যে পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে সমর্থ, আমাদের দেশে সে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া দেশের শস্য দেশে রাখিতে পারে না। এই জন্য আমাদের দেশে নিয়ম ছিল, উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত। রাজায় প্রজায় অর্থসম্বন্ধ ছিল না। এ নিয়মে প্রজা রাজকরের দায়ে নিগৃহীত হইতে পারিত না। যে বৎসর যেমন উৎপন্ন হইত সে বৎসর তদনুপাতে ষষ্ঠাংশ দিয়া রাজকর শোধ করিতে পারিত। একেবারে অজন্মা হইলে রাজাও প্রজার ন্যায় কিছু পাইতেন না। এইরূপে প্রজাপালন ও শস্যরক্ষার ব্যবস্থা দেশে ছিল। অর্থসম্বন্ধ হওয়া অবধি সে নিয়ম উল্টাইয়া গিয়াছে। ইহাতে কৃষকশ্রেণীর ধনাগম ও রাজ-করের হ্রাস-বৃদ্ধি বা অপ্রাপ্তি-দোষ দূরীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয়েই ধনলাভ করিলেও দেশের কৃষককুলও ধনী হইতেছে না, জমীদারকুলও ধনী হইতে পারিতেছে না, তাহার প্রধান কারণ সেই অন্নবস্ত্রহীনতা। কৃষক বিদেশে শস্যবিক্রয়ে ধনলাভ করিয়া নিজেকে এবং সমস্ত দেশকে বিদেশে অন্নবস্ত্র ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে। তাহারা একের নিকট যাহা লাভ করিতেছে, অপর দুই ব্যক্তিকে গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহের ব্যপদেশে তাহাই আবার সলাভ ধরিয়া দিতেছে। কাজেই দেশের অন্নাভাবের প্রতিষেধক কোন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিতেছে না।

এখন এমন কোন জমীদার আমাদের দেশে বর্ত্তমান নাই যে, তিনি নিজ জমীদারীর উৎপন্ন শস্য বিদেশী বণিকের ব্যাপার হইতে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারেন। বিদেশী বণিক্ যৌথ-

ধনে ধনী হইয়া অন্নহীন স্বদেশের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিতে আসিয়া অকাতরে অথচ সুকৌশলে অর্থব্যয় করে, সে ক্ষেত্রে আমাদের জমীদার বা মহাজন স্ব স্ব স্বতন্ত্র চেষ্টায় সেই যৌথ-অর্থের প্রতিযোগিতায় শস্যরক্ষা করিতে পারিয়া উঠেন না। তদ্ভিন্ন এভাবে যে দেশের অন্ন রক্ষা করা যায়, বা স্বদেশের অন্ন রক্ষা করাই যে শস্য-বাণিজ্যের আর একটা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাও এ দেশের জমীদার বা মহাজনের শিক্ষা-বহির্ভূত, জ্ঞান-বহির্ভূত। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের লোকের এরূপ প্রয়োজন, এরূপ অভাব, এমন কি এরূপ আশঙ্কারও কারণ ছিল না। যদি দেশের অবস্থা এমনই হয়, তবে কি উপায় হইবে? অন্য বুভুক্ষিত দেশের লোকেরা প্রচুর অর্থ-হস্তে যখন আমাদের দেশের অন্নহরণ করিতে আসিয়াছে, আর তাহাতে অর্থের প্রতিযোগিতায় যখন আমাদের বাধা দিবার শক্তি নাই, তখন আমাদের জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার অন্য পন্থা আবিষ্কার করিতেই হইবে। সে উপায় আর কিছুই নয়,—আমাদেরও অপর দেশে গিয়া আমাদের দেশের অন্য পণ্য বিনিময়ে, অর্থসংগ্রহ করিয়া অন্য অন্নশালী দেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিয়া আনিতে হইবে।

এই যে কয়টা শব্দে অতি সহজে এই উপায় অবিষ্কার করা গেল, তত সহজে ইহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে, তাহাও বুঝি; আর এ উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বে কত শিক্ষা, কত আয়োজন এবং কত অর্থের প্রয়োজন, তাহাও বুঝি। এই সকল ভাবিলে এ দরিদ্রদেশে বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ উপায়-অবলম্বন চেষ্টা একান্ত অসম্ভব বলিয়াই প্রথমদৃষ্টিতে মনে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া আর নিশ্চিন্ত

বসিয়া থাকিবার সময় বা অবসর আমাদের নাই। বিদেশী বণিকের শস্য-সংগ্রহে আগ্রহ ও অর্থব্যয় দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা শস্য বিক্রয় না করিয়া যখন আর এ যুগে নিস্তার পাইব না, তখন বিদেশী বণিককে শস্যের জন্য আমাদের এদেশে যাহাতে না আসিতে হয়, আমরাই আমাদের শস্যসম্ভার লইয়া তাহাদের গৃহদ্বারে পঁহুছাইয়া দিতে পারি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাহাতে লাভালাভের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা আমাদের দেশের অন্নের উপযুক্ত-পরিমাণ শস্য দেশে রক্ষা করিবার যে সুবিধা পাইব এবং উদ্বৃত্তাংশ লইয়াই যে অন্য দেশে গিয়া বিক্রয়-কার্য্য চালাইতে পারিব, তাহার কতকটা সম্ভাবনা আছে। এখন স্বদেশে অন্ন নাই বলিয়া স্বদেশের অর্থ লইয়া ভিন্ন দেশে অন্ন ক্রয় করিতে বিদেশী বণিককে যে বিপুল আয়োজন করিতে হইয়াছে, আয়োজনের ব্যয়ভারে যে তাহাদের অর্থ অনেক নষ্ট হইতেছে, তাহার কতকটা প্রতিকার যদি এ ব্যবস্থায় আমরা করিয়া দিতে পারি, অর্থাৎ আমাদের ব্যয়ে আমাদের উদ্বৃত্ত শস্য লইয়া তাহাদেরই অন্নসংস্থানের জন্য তাহাদের গৃহ-দ্বারে পঁহুছাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে, তাহারা কতকটা সুবিধা বোধও করিতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও রক্ষার উপায় হয়। তাহারা আমাদের শস্য লইতে যেমন নিজেরা আসিতেছে, তেমনি আমরাও বাহির হইয়া অন্যদেশে আমাদের জন্য অর্থ বা শস্য সংগ্রহ করিতে না গেলে, আমাদিগকে দিন দিন আরও দুর্দ্দশায় পড়িতে হইবে। বস্ত্র সম্বন্ধে যেমন আমরা পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছি, ঘরের অন্ন পরের হাতে বিক্রয় করিয়া, কালে আবার অন্নের জন্যও তেমনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িব। অর্থ বা অন্নসংগ্রহার্থ আমরা বিদেশে

বাহির হই না বলিয়া, অপরে দয়া করিয়া এদেশে শস্য বিক্রয় করিতে না আসিলে আমরা এখনই শস্যাভাব অনুভব করিতেছি। এ প্রথা বেশী দিন চলিলে, আমাদের বিদেশী শস্য-ক্রেতার প্রদত্ত অর্থও যে লাভে-মূলে বাহির করিয়া লইয়া যাইবে, ইহা নিশ্চয়। গত দুর্ভিক্ষের সময় কালি-ফর্ণিয়ার শস্য-বিক্রেতারা এইরূপেই আমাদের উপর দয়া করিয়া গ্রেহাম, রেলি, জার্ডিন স্কিনার প্রভৃতি বিদেশী বণিক্-প্রদত্ত অর্থ লাভে-মূলে লইয়া গিয়া, আমাদের প্রাণরক্ষা অথচ ধন হরণ করিয়া মহানুভবতা দেখাইয়া গিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে চাউলের দর ৪৷৷৹ টাকা হইতে ৫৷৷৹ টাকায় স্থায়িভাবে দাঁড় করাইয়া দিয়া গিয়াছে।

মন এই পর্যান্ত ভাবিয়া, কার্য্য-কারণ প্রতিকার চিন্তায় এতদূর মীমাংসা করিল বটে, কিন্তু যতটা অর্থ পাইলে আমাদের দেশের লোক বহির্ব্বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারে, তাহা কোথা হইতে আসিবে, তাহার ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িল; বহির্ব্বাণিজ্য চালাইতে পারে এমন সুনিপুণ লোকেরও ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া উঠিল। তাহার পর মনে হইল, দক্ষিণ আমেরিকায় বৃটিশ গায়নায় যদি লক্ষাধিক হিন্দুস্থানী বণিক্ বসবাস করিয়া বিদেশী বাণিজ্য চালাইয়া তাহাতে সম্যক্ সাফল্য ও কৃতিত্ব লাভ করিয়া থাকিতে পারে, তবে আমাদের দেশের এই অসম্ভব সম্ভব হইতেই বা বিচিত্রতা কি ? ইহার জন্য প্রাথমিক চেষ্টা কিরূপে করিতে হইবে, কিরূপ লোক লইয়া কার্য্যের সূত্রপাত করিতে হইবে, ইহার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যে শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের প্রয়োজন হইলে, সেরূপ শিক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-সাহায্য-সমিতির সাহায্যে কোন কোন দেশে শিক্ষার্থী পাঠান আবশ্যক কি না,—ইত্যাদি বিষয়ে

দেশের ধুরন্ধরগণের ভাবিবার ও কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।—এই সকল ভাবনায় মন আরও অবসন্ন হইয়া সায় দিল—'তথাস্তু'।

শাস্ত্রবচনে "চান্তিমে কলৌ" কল্কি অবতার হইবার পূর্ণ ভরসা পাইয়া থাকিলেও, আমাদের নিজের হাতে তাঁহার কার্য্য লইতে ছুটিতেছি কেন? অবশ্য কলিকালেও পোয়াটাক ধর্ম্ম আছে, আর সেই ধর্ম্মটুকু দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা 'সংস্কার' 'সংস্কার' করিয়া ক্ষেপিতেছি, কিন্তু সংস্কারটা কোনও অবতারই কোনও দিন আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেন নাই, নিজের কাজ নিজেই করিয়া গিয়াছেন। এই সত্যযুগাচার ভ্রষ্ট হইলে, ত্রেতার লোকের কথাটা ভুলিয়া যাইতেছি কেন? ধ্রুবসত্য শাস্ত্রবাণী পুরাণেতিহাসনিবদ্ধ অবতার সাহায্যপ্রাপ্তির আশা থাকিলেও বিশেষ কোন আশার কথা ছিল না। কারণ, তাঁহারা জানাইতেন, সত্যযুগের আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহাদের যে তিন পোয়া ধর্ম্ম ছিল, ভৃগু-রাম ও দাশরথি-রাম এই দুই অবতারের কৃত একুশবার নিঃক্ষত্রিয় ও রাক্ষসাদি বধ সত্ত্বেও তাহাও রক্ষা হইবে না, কারণ, দ্বাপর আসিলে দ্বাপরের লোককে আর এক পোয়া হারাইতে হইবে। আবার, দ্বাপরে বলরাম ও কৃষ্ণ নানা উপায়ে কুরুক্ষেত্র-প্রভাস বাধাইয়াও দ্বাপরের দুই পোয়া ধর্ম্মও রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন নাই। পারিবেন কেন?—শাস্ত্রের ব্যবহার যে তাঁহারাই স্বীয় উক্তিতে পূর্ব্বে আচারগত শৃঙ্খলার যে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা উল্‌টাইয়া নিজেরাই মিথ্যাবাদী হইবেন কি? কাজেই কলিকাল প্রবেশ করিতে না করিতে, দ্বাপরের দুই পোয়া ধর্ম্মও ক্ষয়িত হইয়া কলিকালে আসিয়া

এক পোয়ায় দাঁড়াইয়াছে। ভগবান্ একালের জন্য ধর্ম্মের এই এতটুকুই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কাজেই আমাদের একদল এতটুকুই লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে ; বেশী চাহিলে পাইব কোথা ?—দিবেই বা কে ? মালিকেরই যে এই ব্যবস্থা ! যে অনন্ত শক্তি হইতে অনন্ত কালস্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার ফলে যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার তুলনায় সমাজ-শক্তি এত ক্ষুদ্র যে, তাহার বিরুদ্ধে কি করিতে পারিবে ?

তবে আমাদের একটা বড় ভরসা আছে।—সেটা কি জান ? সেটা কিন্তু সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের লোকগুলার অপেক্ষা আশ্বাসজনক এবং লাভকর। সত্যযুগের অবতার মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ত্রেতাযুগের অবতার ভৃগু-রাম ও দাশরথি-রাম এবং দ্বাপরাবতার বলরামযুক্ত কৃষ্ণ, কেহ ম্লেচ্ছাচার ক্ষয় করিয়া সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিয়া দিতে পারেন নাই, চেষ্টাও করেন নাই। আমাদের পূর্ব্ব কলিরই অবতারগণের (বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতির) কীর্ত্তিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অবতারগণের কীর্ত্তির অনুসরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের শেষাবতার ভগবান্ কল্কি তেমন করিয়া নিরাশ করিবার জন্য আসিবেন না, তাঁহার আগমনের পর যে কলিকালের এই এক পোয়া ধর্ম্মও সঙ্কুচিত করিয়া "পাপং পূর্ণং পুণ্যং নাস্তি"-রূপ ভীষণ একটা কালের প্রবৃত্তি হইবে আর তাহার মধ্যে যে তিনি এই পৃথিবীটাকে ফেলিয়া দিয়া হাবুডুবু খাওয়াইবেন, তাহা নহে। তেমন ভীষণ কালের কল্পনা শাস্ত্রকারেরা করেন নাই, করিতে পারেন নাই—কারণ, ধর্ম্মই পৃথিবীকে ধরিয়া আছেন। ধর্ম্ম থাকিবে না, অথচ পৃথিবী থাকিবে, এরূপ হয় না। তাই কোন শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তির মধ্যে জাগতিক ব্যবস্থার সেরূপ কালের অস্তিত্ব নাই।

অতএব ভগবান্ কল্কির আসিবার পরেই "পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি"—সত্য যুগ আমরা ফিরিয়া পাইব। যখন চার পোয়া ধর্ম্মই ছিল, তখনই ত্রেতার পতন (এক পোয়া ধর্ম্মহীনতা) সত্যযুগের লোকেরা আপনাদের পূর্ণ পুণ্যাবরণ বলেও নিবারণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, আর এখন এই পোয়াটাক ধর্ম্মের বলে, আমরা ভগবানের অবতারের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া সমাজ-সংস্কার করিয়া পৃথিবীতে কেবল পুণ্যাত্মক সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, এ কথা কি সম্ভব? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, পুণ্যপ্রবৃত্তি যাহা আছে, তাহার দম্ভ করিও না, তাহার বলে ভগবানের উক্তিতে অবিশ্বাস করিতে, কালস্রোতে বাধা দিতে বা অবতারের কার্য্য নিজহস্তে লইতে যাইও না! এখানেও সেই স্বদেশী আন্দোলনের নিরাপত্তি সহিষ্ণুতা (Passive Resistance) দেখাইয়া যাও।

কিয়ৎপরে মনে হইল, এই ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ চেষ্টাটাই হয় ত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিমূলক নহে। দম্ভে ইহার উৎপত্তি, যশোলাভের আকাঙ্ক্ষাই ইহার পরিণাম, কাজেই ইহাও বিধিনির্দ্দিষ্ট কালোচিত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের নিগূঢ়-বন্ধনে কর্ম্মসূত্রে এ কালের ধার্ম্মিক ও ভ্রষ্টাচারী উভয়েই সমানভাবে বাঁধা আছে। ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, তবে কি ধার্ম্মিকের দল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে?—বাপরে! তাও কি হয়!—নিশ্চেষ্ট থাকিলে কলির মাত্রা পূর্ণ হইবে কিসে? পাপের ভরা ভরিবে কেন? অকর্ম্মা বা নিষ্কর্ম্মা তোমায় থাকিতে দিবে কে? কালস্রোতে তোমার কর্ম্মস্রোতের পথ দিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। প্রবৃত্তির দমন হইতে পারে, প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না। প্রবৃত্তিই তোমায় দিবারাত্র কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবে। কর্ম্মভূমিতে নিষ্ক্রিয়তার স্বপ্ন দেখা

চলিতে পারে না, আর কর্ম্মশূন্য জাগ্রতাবস্থার কথা ভাবিতে পারা যায় কি ?

তবে কি হইবে ?—যেমন চলিতেছে, তেমনই চলিবে কি ? না চলিবে কেন ? কালের উপর তোমার ক্ষমতা কোথা ?—আর তোমরা এমন সব কাজ না করিলে কল্কি আসিবেন কেন ?—বটেই ত।—'তথাস্তু।'

সমাপ্ত